স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলপত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪ ও জুন ২০১৫

বাংলা (Bengali)

ভিত্তিমূলক (Foundation)

(FBG : Foundation Course in Bengali)

যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর অনধিক ২৫০ শব্দে দিন ঃ

খ) রক্তের গঠন, মানুষের শরীরে রক্তের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা এবং রক্তের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- **উঃ– রক্ত ঃ–**

রক্ত একপ্রকার অস্বচ্ছ, লবণাক্ত, ক্ষারধর্মী তরল সংযোগ কলা।

রক্তের কাজ ঃ– রক্তের প্রধান কাজগুলি হল ঃ–

১) খাদ্য বস্তু পরিবহন ঃ–

রক্ত অন্ত্র শোষিত সরল খাদ্যবস্তু দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে দেয়। রক্ত দেহের বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্থান থেকে খাদ্য বস্তু দেহের বিভিন্ন কলা শেষে প্রেরণ করে।

২) শ্বাসবায়ু পরিবহণ ঃ–

রক্ত ফুসফুস থেকে O_2 বহন করে কলা কোষে পৌছে দেয়, এবং শ্বসনের ফলে উৎপন্ন Co2 গ্যাসকে ফুসফুসের বায়ু থলিতে পৌঁছে দেয়।

৩) দূষিত পদার্থের অপসারণ ঃ–

কোষে উৎপন্ন বিপাক জাত দূষিত পদার্থগুলিকে রক্ত কোষ থেকে অপসারিত করে দেহের রেচন অঙ্গে প্রেরণ করে।

৪) পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে ঃ–

রক্ত, হরমোন, ভিটামিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থকে তাদের ক্রিয়ার স্থানে বহন করে আনে।

আমাদের শরীরের ভিতর যে লাল তরল পদার্থ আছে তাকেই রক্ত বলা হয়। এই রক্ত হল এক রকমের বিশেষ ধরনের জীবকোষের সমন্বয়। রক্ত আমাদের শরীরের ভিতরে বিভিন্ন কোষে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন ও পাকস্থলী থেকে খাদ্য বহন করে নিয়ে যায় এবং বহিরাগত যেকোনও ধরনের রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে।

রক্তকনিকারে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি– যথা– ১) লোহিত কনিকা, ২) শ্বেতকনিকা, ও অপরটি হল ৩) বনহীন কনিকা।

লোহিত কনিকার লাল অংশটুকু বলা হয় হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে ফুসফুসে আগত বায়ু থেকে অক্সিজেনকে শোষন করে শরীরের অপরিশোধিত রক্তকে শোধন করা হয়। তাছাড়া খাদ্য পরিবহনের কাজও লোহিত কনিকার সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

শ্বেতকনিকা শরীরের বহিরাগত রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে শরীরকে রোগমুক্ত রাখার চেষ্টা করে খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশ শরীর থেকে নির্গত করে দিতে সাহায্য করে।

বর্ণহীন কনিকার কাজ হল শরীরের ছোট বা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে যেতে থাকলে বর্ণহীন কনিকার সাহায্যে রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়। রক্তের মধ্যে লোহিত কনিকার অন্যান্য তুলনায় অনেক বেশী থাকে বলে আমরা খালি চোখে রক্তকে শুধু লালই দেখতে পাই।

আমাদের শরীরের ভিতর যে লাল তরল পদার্থ থাকে তাকে বলে রক্ত। রক্ত হল একরকমের বিশেষ ধরনের জীবকোষের সমন্বয়। রক্তকে আমরা প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারে– (১) রক্তকণিকা, (২) প্লাজমা।

অ্যান্টিজেন 'এ' এবং অ্যান্টিজেন 'বি' এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে রক্তকে প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন– 'এ', 'বি', 'এ-বি' এবং 'ও'। যদি কারও রক্ত অ্যান্টি - এ সিরামের সংমিশ্রণে জমাট বাঁধে তাহলে এই রক্তকে বলে 'এ'। কারো রক্ত অ্যান্টি - বি সিরামের সংমিশ্রণের ফলে জমাট বাঁধে তাহলে তাকে বলে 'বি' শ্রেণীভুক্ত রক্ত। আর যদি কারো রক্ত অ্যান্টি 'এ' সিরাম ও অ্যান্টি- বি সিরাম উভয়ের সংমিশ্রণে জমাট বাঁধে তাহলে এই রক্তকে বলে – এ-বি, আবার যদি কারো রক্ত কোন অ্যান্টি বডির সংমিশ্রণের ফলে জমাট না বাঁধে তবে সেই রক্তকে বলে 'ও' শ্রেণীভুক্ত (এরপর পাতা নং ১৩১-১৩২ মূল বই থেকে যোগ করতে হবে)।

আমাদের শরীরের ভিতরে বিভিন্ন কোষে ফুসফুস তেকে অক্সিজেন ও পাকস্থলী থেকে খাদ্য বহন করে নিয়ে যায় এবং বহিরাগত যেকোনও দরণের রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে।

ঘ) বাংলা ভাষাত ধ্বনি, বর্ণ, অক্ষর, দ্বিস্বর ধ্বনি ও অর্ধস্বর ধ্বনি এবং স্বরধনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- কথা বলার সময় শ্বাসবায়ু বেরিয়ে যায় এবং গলা, জিভ, নাক দাঁত ইত্যাদিকে স্পর্শ করে। ফলে নানা আওয়াজ উৎপন্ন হয়। এই গলা,জিভ ইত্যাদি থেকে আওয়াজ উৎপন্ন হয় বলে এই অঙ্গকে বলে বাগযন্ত্র। এই বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থযুক্ত আওয়াজ বলে ধ্বনি।

যেমন ঃ– আ+ম+অ- এক একটি ধ্বনি।

বর্ণ ঃ–

ধ্বনিকে লিখে প্রকাশ করতে গেলে যে সব সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার করা হয় তাদের বলে বর্ণ। যেমন অ- উচ্চারণ করলাম এটা হল ধ্বনি। বিশেষ সংকেত চিহ্নে অ লিখলাম। এই হল বর্ণ।

অক্ষর ঃ–

ধ্বনি সাংকেতিক চিহ্নের নাম বর্ণ। কিন্তু বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে শব্দস্থ যতটুকু ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় তাকেই অক্ষর বলে।

যেমন– 'বসুমতি' (ব-সু-ম-তী) এই চারটি অক্ষর নিয়ে শব্দটি গঠিত। প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে একটি করে স্বধ্বনি যুক্ত আছে। যেমন-র+অ = ব, স+উ= সু, ম+অ = ম

দ্বিস্বর ধ্বনি ঃ–

বাংলায় যৌগিক স্বর মাত্র দুটি ঐ এবং ঔ। এগুলি প্রত্যেকটি দুটি করে স্বরের মিলে গঠিত বাংলার দ্বি স্বরধ্বনি। যেমন– ঐ=ও+ই, ঔ = ও+ঔ। বাংলায় আরো স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন– এই=এ+ই। এখানে দুটি স্বতন্ত্র একক স্বর রূপে উচ্চারিত হচ্ছে না। দুটি মিলিয়ে একসঙ্গে যৌগিক স্বররূপেই উচ্চারিত হচ্ছে। আসলে বাংলায় শুধু দুটি যৌগিক স্বর লেখার জন্য নির্দিষ্ট বর্ণচিহ্ন আছে। অন্য যৌগিক স্বরগুলি লেখার জন্য

AMBITION

নির্দিষ্ট বর্ণচিহ্ন নেই।

অধঃস্বর ধ্বনি ঃ–

যৌগিক স্বরে দুটি স্বরযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু দুটি স্বরই স্বতন্ত্র একক স্বরের মতো পূর্ণাঙ্গ নয়। দ্বিতীয় স্বরটি অর্ধোচ্চারিত, এই দ্বিতীয় স্বরটিকে বিশেষজ্ঞরা ঠিক স্বরধ্বনি না বলে অর্ধস্বধ্বনি বলতে চান। যেমন ঐ=ও+ই এই যৌগিক স্বরের দ্বিতীয় স্বরই হল অর্ধোচ্চারিত। তাই এটি অর্ধস্বর। অর্থাৎ আধখানা উচ্চারিত হওয়া স্বরকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে।

যেমন – 'মই' কথাটির 'ই' উচ্চারিত হচ্ছে আধখানা। এই আধখানা উচ্চারিত স্বরের তলায় হসন্ত দিয়ে বোঝাই। যেমন– ই, উ, এ, ও।

স্বর ঃ– উচ্চারণের সময়ের কম বেশি অনুযায়ী বাংলা স্বর দুই প্রকার। হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর। এছাড়া রয়েছে প্লুতস্বর।

অর্ধস্বর ঃ অর্ধস্বর ধ্বনি হল চারটি। সেগুলি হল ই, উ, এ, ও।

ব্যঞ্জন ঃ– ব্যঞ্জন ধ্বনিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী, উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনবর্ণকে সাতভাগে ভাগ করা যায়। কণ্ঠবর্ণ, তালব্যবর্ণ, মূর্ধণ্যবর্ণ, দন্তবর্ণ, ওষ্ঠবর্ণ, দন্ত্যোষ্ঠবর্ণ ও নাসিক্যবর্ণ।

উচ্চারনের রীতি অনুযাযী ব্যঞ্জনবর্ণকে ১৪ টি ভাগে ভাগ করা যায়। স্পর্শবর্ণ, ঘোষবর্ণ অঘোষবর্ণ, নাসিক্য বর্ণ, উষ্ণ বর্ণ, অন্তস্থ বর্ণষ অর্ধস্বর, তরলাস্বর, পার্শিক ধ্বনি, কম্পনজাত ধ্বনি, শিশধ্বনি, তাড়নজাত ধ্বনি, অর্ধক্যঞ্জন ও আশ্রয়ীভাগ বর্ণ।মানুষের ইচ্ছায় চার গলা থেকে নিঃসৃত স্বর বায়ুস্তরে শোনার মত যে স্পন্দন শোনে তাকে বলে ধ্বনি যেমন– অ, আ, ই, ঈ, ক, গ, শ ইত্যাদি। এদের উচ্চারণটুকুই ধ্বনি।

ধ্বনি হল– বর্ণের উচ্চারিত রূপ। ধ্বনি আমরা কানে শুনি, চোখে দেখি না, তাই ধ্বনি হল শ্রুতিগ্রাহ্য

ধ্বনি হল– দু প্রকার (ক) স্বরধ্বনি, (খ) ব্যঞ্জনধ্বনি।

ক) স্বরধ্বনি ঃ–

যে ধ্বনি মানুষের গলা থেকে স্বাভাবিক ভাবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয় তাকে বলে স্বরধ্বনি। যেমন, অ, আ, উ, এ ইত্যাদি।

খ) ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ–

যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয় এবং উচ্চারণকালে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন ক, চ, জ, ট ইত্যাদি।

আমরা মুখ দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারণ করি তা কোন বিশেষ চিহ্ন বা প্রতীক দ্বারা লিপিবদ্ধ করলে তাকে বলে বর্ণ। অর্থাৎ বর্ণ হল ধ্বনির লিখিত রূপ।

বাগযন্ত্রের সাহায্যে কোন শব্দের যতটুকু অংশে একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তাকে বলে অক্ষর। যেমন বসুমতী এই শব্দে ব-সু, ম, তী চারটি অক্ষর আছে।

২।যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

ক) নালসে পিঁপড়ের বাসা বানানোর প্রণালী বর্ণনা করুন। প্রসঙ্গত তাদের বসবাস ও জীবনকাহিনী, খাদ্যাভাস, লড়াইয়ের কৃৎকৌশল বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ-গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের লেখা 'পিঁপড়ের লড়াই" প্রবন্ধে পিঁপড়ের বুদ্ধি ও তাদের বাসা নির্মাণ একধরনের পিঁপড়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নালসো পিঁপড়ে নামে একধরনের পিঁপড়ের বাসা নির্মাণ প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর। এখন আমরা সেই নালসা পিঁপড়ের বুদ্ধি ও তাদের বাসা নির্মাণ কৌশলটিই আলোচনা করবো।

নালসা পিঁপড়েরা গাছের উঁচু ডালে অনেকগলি সবুজ পাতা একসঙ্গে জুড়ে বড় বড় গোলাকার বাসা তৈরী করে। এই বাসায় একসঙ্গে শত শত পিঁপড়ে বাস করে। বাসা নির্মাণের সময় অনেকগুলি নালসো কর্মী একসঙ্গে পাশাপাশাভাবি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পরস্পর সন্নিহিত দুটি পাতাকে একত্রিত করে টেনে ধরে রাখে তখন অপর কর্মীরা তাদের কীড়া মুখে করে নিয়ে আসে। শুঁড়ের সাহায্যে কীড়াগুলির মুখের কাছে সুড়সুড়ি দিলেই তারা একপ্রকার আঠালো সুতো বের করতে থাকে। কাপড় বোনার সময় তাঁতিরা যেমন একবার এদিকে একবার ওদিকে মাকু চালায়, কতকটা সেই কায়দায় কর্মীরা ক্রীড়াগলির মুখ একবার এপাতা আবার ও পাতায় ঠেকিয়ে সূক্ষ্ম সুতোর সাহায্যে পাতার ধারগুলি জুড়ে দেয়। এইভাবে বুনা শেষ হলে বড় বড় ফাঁকাগলিকে বার বার সুতো বুনে সাদা কাগজের মতো পাতালা পর্দায় ঢেকে দেয়। বাইরে বেরোবার জন্য একটি বা দুটি মাত্র পথ রাখে। পাতার পর পাতা জুড়ে ক্রমশ বাা বড় করে তোলে।

আবার বাসা বড় করার জন্য যদি কোন সময়ে একটু দূরবর্তী নিচের ডাল থেকে পাতা নেবার প্রয়োজন হয়, তখন এরা দলে দলে বাসার নিচের দিকে জড়ো হতে থাকে পরস্পর একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে শিকলের মতো নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ক্রমে ক্রমে অপরাপর কর্মীরা এসে সেই শিকল বাড়াতে বাড়াতে সর্বশেষ পাতার নাগাল পেলেই কয়েকজন সেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। অপর কর্মীরা তাদের পা কামড়ে ধরে। তখন উপর দিক থেকে শিকল ক্রমশ খাটো করতে করতে নিচের পাতাকে টেনে কাছে এনে কীড়ার সাহায্যে আগের মত করে মূল বাসার সঙ্গে শক্ত করে গেঁথে দেয়। এভাবেই নালসা পিঁপড়েরা তাদের বাসা তৈরী করে।

এই বাসা তৈরীর জন্য চাই বুদ্ধি। এই বুদ্ধি নালসো পিঁপড়ের আছে বলেই এইভাবে বাসা নির্মাণ করতে পারে। তাই তাদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয় এবং লেখক যে এই বুদ্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছেন তাতে আমরা লেখকের কাছে চিরদিন ঋনী হয়ে থাকবো তাই নয় কি ?

২।খ) 'হাড়' গল্পে ইংরেজ ভক্ত ধনী ও দুর্ভিক্ষগ্রস্থ জনতার জীবনের যে বিশাল ব্যবধান লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটি বর্ণান করুন। প্রসঙ্গত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

উত্তর - দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা হার গল্পে সাম্যবাদী মানবতাবাদী লেখক দুটি বিপরীত শ্রেণীর চরিত্রের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। একদল অভুক্ত আর একদল ভোগের প্রাচুর্য্যে তীপ্ত। একদিকে লোহার ফটকের মধ্যে কুকুরের পাহারায় নিরাপদ নিশ্চিন্ত ইংরেজভক্ত রায়বাহাদুরের অলস বিলাসী জীবন এবং অন্যদিকে যারা অভুক্ত তারা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ডাস্টবিনের খাবার জানোয়ারের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে এবং হাইড্রেনের নোংরা জল খেয়ে কোনরকমের জীবনধারণ করা। এই দুইয়ের জীবন ধারার বিস্তর ব্যবধানের মাঝখানে মধ্যবিত্ত বর্গের মানুষ হলেন লেখক, এরা না পারে ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের পাশে দাঁড়াতে। অথচ তাদের সংগতিপূর্ণ মন শোষিত জনতার জন্য ব্যাথাবোধ করে মাত্র, তাদের জন্য কিছুই করতে পারেন না। কারণ তাদের জীবনও তো সংশয়ে ভরা। তাদের পায়ের তলার মাটি নড়বড়ে।

এক সংশয় চিত্তে মধ্যবিত্ত যুবক পিতৃবত রায়বাহাদুর এল .এইচ চ্যাটার্জীর বাড়ীতে চাকরীর উমেদারী করতে এসেছে। যেটা পেলে হয়তো তার জীবনের ভীত দৃঢ় হতে পারে। কিন্তু এই চাকরিটা পাওয়ার ক্ষেত্রেও তার সংশয় রায় বাহাদুর এ ব্যাপারে সম্মত হবেন কিনা অথচ তার ধারনা রায় বাহাদুর একটা সোচা দিয়ে দিলেই হয়ে যেতে পারে চাকরি। ব্যবহারকরলেও চাকরির ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করতেও প্রস্তুত নয়। তার মত হল কোন এরুটিভ সারভিস্ট-এ ঢুকে 'অ্যাডভেঞ্চারের' অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় না। কিন্তু এই সামান্য চাকরি যে এই মধ্যবিত্তের কাছে কতখানি অসামান্য তা এই খেয়ালী ধনী ব্যক্তির বোধগম্য নয়। যে নাকি তার খেয়াল মেটাতে মন্ত্রসিদ্ধ হাড় কেনে, যার দাম ৫০০০ টাকা।

অপর দিকে বাইরের থেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর আত চিৎকার ভেসে আসছিল। একমুঠো ভাতের জন্য তারা জান্তব চিৎকার করছে।

অথবা ডাস্টবিনের জানোয়ারের সঙ্গে কিছু খাবার খোঁজে পেয়ে কলহল চিৎকার করছে। এই উদরভর্তির জন্য চিৎকার রায় বাহাদুরের গল্পে

AMBITION

ব্যাঘাত তিনি অত্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করেছেন।
"পার্কের ও গুলোর জালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না"। কিন্তু সাম্যবাদী মানবতাবাদী লেখক বর্তমান জীবনের সংশয় ক্ষয়ে বিচ্ছিন্নতার বেদনা নিয়েও ভবিষ্যতে আশা শোষণ করেন যে ভবিষ্যতের একদিন দরিদ্র্যের হাতের হাড় মন্ত্র সিদ্ধ অস্ত্র হয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে পালটে দেবে এ প্রসঙ্গে সাম্যবাদী কমিউনিষ্ট কবি সুকান্তের উক্তি বিশেষ প্রনিধান যোগ্য।

গ) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন, তার রচনাকাল, অন্তঃ চারজন রচয়িতার নাম ও বিষযবস্তু সম্পোর্কে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের ইতিহাসে যে একটি মাত্র গ্রন্থকে নিঃসন্দেহে সাহিত্য রূপে স্থান দান করা যেতে পারে তা চর্যাপদ। নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। গীতিকবিতার আকারে এই চর্যার পদগুলি রচিত হয়েছে।

চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন যে সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর দিকে সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ আর্বিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ সুনীতি কুমার এবং অন্যান্য ভাষা বিজ্ঞানীগণ মনে করে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থের চৌরাশী সিদ্ধার নাম আছে তাদের অনেকেই চর্যাপদে রচয়িতা। এ থেকে একটি বিষয় অন্তত নিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে চর্যাপদের রচনাকাল নিশ্চিতভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী।
চর্যাপদের রচয়িতাদের সাধারণতঃ সিদ্ধাচার্য্য নামে অভিহিত করা হয়। এঁদের প্রত্যেকেরই নামের পর 'পাদাচার্য্য' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়। এই চর্যাপদে ২৪ জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে কাহ্ন পাই প্রধান। এছাড়া ভুসুক পা, সরহ পা, কুক্কুরী পা, লুই পা, শান্তি পা, শবরী পা, বানা পা, তন্ত্রী পা, কঙ্কন পা, প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণ বিভিন্ন ধরনের পদ রচনা করেছেন।

চর্যাপদের বিষয় বস্তুর বৌদ্ধ সহজপন্থী সাধকদের ভজন সম্পর্কিত কিছু গূঢ় তত্ত্ব বা সাধন সংকেত। সিদ্ধাচার্যগণ যে সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্যে চর্যাপদগুলি রচনা করেন নি তা সহজেই অনুমেয়। বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থী সাধকগণ নিজেদের সাধন-ভজন পদ্ধতি নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার উদ্দেশ্যে সংকেত বাক্যে এদের প্রচার করেছিলেন। এই কারণেই চর্যাপদগুলির একটা সাধারণ অর্থ সহজেই বের করা যায়। কিন্তু গূঢ় অর্থ হয়তো এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে।

তাই সাধারণ অর্থে আমরা চর্যাপদে তৎকালীন সমাজের নানা চিত্র পাই। ৩৩ সংখ্যক পদে পাই- টিলার উপর বাস করে যে গৃহস্থ বধু, যার কোন প্রতিবেশী নেই, অথচ নিত্য আসে অতিথি, তার দারিদ্র্য বিড়ম্বিত জীবনে।
"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।।"
হয়তো এটা কোন সাধক এর গৃহ। নিত্য সেখানে শিষ্যরা বা অতিথিরা আসে। সে সাধক অত্যন্ত গরীব। এইভাবে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা গিয়েছে।

৩। যে কোনও চারটি প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

ক) ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে কিশোর রবীন্দ্রনাথের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার বর্ণনা করুন ?

উত্তর ঃ- জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়ার পথে ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় মানুষের জীবনধারা। কেউ কেই জীবনে চলার পথে দেখা দৃশ্যগুলি ছবি স্মৃতির পটে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। এইরকমই বিলেতে থাকালীন কিছু স্মৃতি লেখক চিত্ররূপ ধরে রেখেছেন তাঁর জীবনস্মৃতি প্রবন্ধের বিলাত অংশে।

বিলাত আসার লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরা। তাই একদিন ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লেখকের মুখের দিকে তাকিয়েই প্রথমে তাঁর মাথার তারিফ করে বললেন – 'বাহবা, তোমার মাথাটা তো চমৎকার, এই ছোট কথাটা যে লেখকের মনে আছে তার কারণ এই .যে বাড়ীতে লেখকের দর্পহরণ করার জন্য যাঁর প্রবল অধ্যবসায় তিনি বিশেষ করে লেখকের এই কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অনেকের সঙ্গে তুলনায় কোনমতে মধ্যমশ্রেণীর বলে গণ্য হতে পারে। কেননা এটা সৃষ্টিকর্তার নানা প্রকার কার্পণ্য বলে ধরে তিনি নীরর দুঃখ অনুভব করতেন।
এছাড়া ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে পড়াকালীন সেখানকার ছাত্ররা লেখকের সঙ্গে কিছু মাত্র রূঢ় বা খারাপ ব্যবহার করেনি। এমনকি অনেক সময় তারা লেখকের পকেটের মধ্যে কমলালেবু, আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যেত। তার থেকে ধারণা জন্মে যে তিনি বিদেশী বলেই হয়তো ছাত্র রা তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্কুলে তার বেশীদিন পড়ার সৌভাগ্য ঘটেনি।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলের স্মৃতি লেখক সুন্দর চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁর 'জীবন্মৃতি' বিলাত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ঘ) বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে 'রামায়ন', 'মহাভারত' ও 'ভাগবত' গ্রন্থয়ীর রচয়িতাদের নাম ও পরিচয় দিন।

উত্তর ঃ- বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের ইতিহাসে যে একটি মাত্র গ্রন্থকে নিঃসন্দেহে সাহিত্য রূপে স্থান দান করা যেতে পারে তা চর্যাপদ। নেপালের রাজদরবারে গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। গীতিকবিতার আকারে এই চর্যার পদগুলি রচিত হয়েছে।

AMBITION

চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্যকদের বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করে যে সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর দিকে সিদ্ধাচার্য লুইপাদ আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ সুনিতী কুমার এবং অন্যান্য ভাষা বিজ্ঞানীগণ মনে করে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকর গ্রন্থের চৌরাশী সিদ্ধার নাম আছে তাদের অনেকেই চর্যাপদে রচয়িতা। এ থেকে একটি বিষয় অন্তত নিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে চর্যাপদের রচনাকাল নিশ্চিতভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী।

চর্যাপদের রচয়িতাদের সাধারণতঃ সিদ্ধাচার্য নামে অভিহিত করা হয়। এঁদের প্রত্যেকেরই নামের পর পাদাচার্য উপাধিটি ব্যবহার করা হয়। এই চর্যাপদে ২৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে কাহ্ন পা-ই প্রধান। এছাড়া ভুসুক পা, সরহ পা, কুক্কুরী পা, লুই পা, শান্তি পা, শবরী পা, বীনা পা, তন্ত্রী পা, কঙ্কন পা প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যগণ বিভিন্ন ধরনের পদ রচনা করেছেন।

চর্যাপদের বিষয় বস্তুর বৌদ্ধ সহজপন্থী দাধকদের ভজন সম্পর্কিত কিছু গূঢ় তত্ত্ব বা সাধন সংকেত। সিদ্ধাচার্যগণ যে সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্যে চর্যাপদগুলি রচনা করেন নি তা সহজেই অনুমেয়। বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থী সাধকগণ নিজেদের সাধন ভজন পদ্ধতি নিজেদের গোষ্ঠীর মধে সীমাবদ্ধ রাখবার উদ্দেশ্যেই সংকেত বাক্যে এদের প্রচার করেছিলেন। এই কারণেই চর্যাপদগুলি একটি সাধারণ অর্থ সহজেই বের করা যায়। কিন্তু গূঢ় অর্থ হয়তো এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে।

তাই সাধারণ অর্থে আমরা চর্যাপদে তৎ কালীন সমাজের নানা চিত্র পাই। ৩৩ সংখ্যক পদে পাই টিলার উপর বাস করে যে গৃহস্থ বধু, যার কোন প্রতিবেশী নেই অথচ নিত্যে আসে অতিথি, তার দারিদ্র বিড়ম্বিত জীবনে।

"টলিত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।

হয়তো এটা সাধক এর গৃহ। নিত্য সেখানে শিষ্যরা বা অতিথিরা আসে। সে সাধক অত্যন্ত গরীব। এইভাবে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা গিয়েছে।

ঙ) 'চৈতন্যভাগবত', চৈতন্যচরিতামৃত' ও চৈততন্যমঙ্গল' গ্রন্থত্রয়ীর যে-কোনো এউকটির কবি ও কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন ?

উত্তর ঃ-চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি বাংলায় রচিত প্রথম চৈতন্য জীবনী কাব্য। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' নানাম কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণদাসের কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্য জীবনী হিসেবে শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কেন মধ্যযুগে ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ। কেননা, বৃন্দাবন দাস আদি ও মধ্য খণ্ডের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে, চৈতন্যলীলার অন্ত্যপর্বের উপর কবিরাজ গোস্বামী গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তিনটি খণ্ডে ৬২টি অধ্যায়ে তাঁর কাব্য বিভক্ত করেছেন। আদি খণ্ডে ১৭টি অধ্যায়ে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় পর্যন্ত কাহিনী বর্নিত। মধ্য কণ্ডে ২৫টি অধ্যায়ে রায় রামানন্দের সাথে সাধ্যসাধন সম্পর্কিত আলোনারূপ সমাজের সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎকার প্রকাশানন্দের সাথে চৈতন্যের তর্কযুদ্ধ ও প্রকাশানানন্দের পরাভব প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত। অন্ত্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যরে শেষবার বৎসরের দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বর্ণনায় কবির কলম স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে।

গদ্যের বিষযবস্তুকে কবি সুললিত পয়ার ত্রিপদী ছন্দে সংহত করেছেন। অপূর্ব ভাষা মাধুর্যে, ছন্দ ও অলংকারের সুষমায় এবং কাব্যগুণে গ্রন্থটি কালোত্তীর্ণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে পুষ্ট নয়, বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

চ) আরাকান রাজসভার যে -কোনো একজন কবি ও কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন ?

উত্তর ঃ- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল দেবতা ও ধর্মকেন্দ্রিক, ধর্ম বা দেবতা নিরপেক্ষ চরিত্র বা আদর্শ সেখানে কখনই প্রাধান্য লাভ করেনি, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য মধ্যযুগের এই প্রধান তিন প্রকার সাহিত্যই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে কবিগোষ্ঠীর আর্বিভাব ঘটেছিল, সেইসব মুসলমান কবির কাব্যগুলি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে নবরূপ দান করেছিল।

সৈয়দ আলাওল অসমাপ্তত লোরচন্দ্রানী সমাপ্ত করেন। তাছাড়া সইফুল মুলক বদিউজ-জমাল গুপ্তপয়কর প্রভৃতি লেখেন। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতী।

সৈয়দ আলাওল দৌলত কাজির পরে আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবি। আলাওলের দেওয়া আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁর জন্ম। অল্প বয়স থেকেই আলাওল বিদ্যাচর্চার আগ্রহী ছিলেন। হিন্দু, সংস্কৃত, ফরাসি প্রভৃতি অমাত্য মাগন ঠাকরের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কাব্য পদ্মাবতী মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর তিনি সোলেমা, সৈয়দ মহম্মদ প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

পদ্মাবতী–মালিক মহম্মদ জায়সির হিন্দি কাব্য পদুমাবৎ অবলম্বনে- আনুমানিক ১৬৪৫– ৪৬ খ্রীঃ 'পদ্মাবতী, রচিত হয় রাজস্থানে প্রচলিত পদ্মিনী বা পদ্মাবতীর কাহিনী নিয়ে জায়সি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। পদ্মাবতী তে ইতিহাসে কাহিনীর সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত হয়ে এক ধরনের রোমান্টিক আবহাওয়া আভাসিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রচারমূলক সাহিত্য ধারায় এই ধরনের মানবীয় বিষয়ের অবতারনা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। সেদিক থেকেও কাব্যটির বিশেষ মূল্য আছে।

মধ্যযুগে বেশীরভাগ সাহিত্য যেখানে দেবমাহাত্ম্যমূলক সেখানে আলাওল ও দৌলত কাজীর কাব্যগুলি নর-নারীর রোমান্টির প্রেমগাথামূলক কাব্য হওার এর স্বাতন্ত্র্য মধ্যযুগে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠল।

মধ্যযুগে ভক্তিবাদের আবহাওয়ায় মুসলমান কবিদের কাব্যের মানবতাবাদ বৈপরীত্য সৃষ্টি করে সেই যুগের গতানুগতিকাকে ভঙ্গ করল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত ছিল গোষ্ঠী নির্ভর ধর্মীয় সাহিত্য, সেখানে মুসলমান কবিদের সাহিত্য ধর্ম নিরপেক্ষ আবেদন নিয়ে উপস্থাপিত হল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রধানত ছিল ভক্তির কথা। দেবতার কথা, সেখানে ভক্তি থাকার বদলে প্রেমের সঙ্গীত দেবতার বদলে মানুষের বাসনার অভিব্যক্তিতে মুসলমান কবিরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য মেলে ধরলেন।

বৈশিষ্ট্যঃ– আলাওল অনুবাদক হলেও তিনি ভাবানুবাগ করেছেন,– যেমন–

'যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন।

আলাওল ছিলেন পন্ডিত কবি, পান্ডিত্য ও বৈদগ্ধের পরিচয় তাঁর কাব্যগুলিতে বিশেষত পদ্মাবতী কাব্য। আলাওল দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক, প্রেম ভাবনার সাংসারিক ও বর্ণনারীতিতে রিয়ালিষ্ঠিক।

AMBITION

Bachelors Programme
B.D.P.
Assignment - Decmber, 2014 & June, 2015
FEG : Foundation Course in English

1) Answer any one of the following :

a) Describe how the South African farmers fought with the locusts. What work did Margaret do?

Ans.-A warning was aired by the Govt. that locusts might arrive in swarms. This was a news of much worry and Richard, the farmer was perturbed. Proving the warning true the locusts arrived. A great fear gripped the farming family. The servants came out the kitchen. Both Richard and Old Stephen's calling brought the cook boy and the house boy outside. The cook boy began to beat the ploughshare and the house boy ran off to collect metallic objects for ringing. Wood and grass were piled to lit fire. Soon two white men got busy in the work and column of smoke began rising from all around the farmland. A swarm was advancing and a strange darkness covered the area inspite of the sun blazing. Stephen, the old farmer filling the petrol tins with hot tea and water supplied the thirsty labourers. Locusts were falling everywhere and being unable to bear heavy load of those insects branches as well as a tree broke. Stephen groaned out saying everything was finished. Margaret also became hopeless. The whole day the men tried to drive away the harmful insects throwing hot water, burning fire and debating tin cans. But maximum effort of the farmers caused minimum loss to the locusts. Old Stephen and Richard came back home as defeated soldiers. At night they were discussing over the Government pamphlet that is instructions of defeating the hoppers. In the morning Margaret wondered seeing the locusts were fanning their wings to free them out of night dews. Swarms, one after another were taking wing like small aircraft. By midday the cloud had left the farm and the men got relief from tension.

d) Describe briefly how Gajpati saved the baby from the hyenas.

Ans.-Gajpati was an elephant who was according to his master the biggest, best and most intelligent elephant in all Asia.

One afternoon Karim and his wife camped near the Rapti River. Karim's wife went to the river to bring water. Finding her late in coming Karim worried and shouted by her name. then putting the baby under the custody of Gajpati Karim ran off to find out his wife. Both Gajpati and the baby were in a jolly mood. Gradually darkness covered everything. Hyenas came out of the den. The baby's cry tempted the ferocious animals and they moved to the target. Gajpati was trying to soothe the baby. Then sensing the presence of the hyenas Gajapti squealed a threat. In the mean time the nocturnal animals came close, though they were out of sight of Gajpati. The elephant was tied to a huge wild mango tree. In anger he wanted to break it down to make him free. He did not succeed. Angrily he made of the hyenas and attacked the tree again. Next moment he changed his plan and shortly after pounced on a hyena. Its body stamped to a pulp. The baby was half sleeping and after midnight Gajpati dozed too. In the mean time waking up, the baby moved several yards away. Suddenly Gajpati woke and found the baby out of his range. The hyenas also darted in. he heavily moved forward and the chain cut into his fleshy. At that moment the great tree fell down upon Gajpati and the baby, the hyenas ran off and did not return.

2. Answer any one of the following :

a) What does Indira Gandhi say about the government of India's Family Planning Programme?

Ans.-India is a developing country and her population is increasing by leaps and bounds. This can affect our socio-economic development. The normal life style can also be affected. Rising population brings deficiency in food, deforestation for providing more shelter, increasing of carbon-di-oxide and growth of many new diseases. If this rate of increasing of population goes on there will be and extreme disorder in social life. The economy will collapse totally. So the Government of India has taken a stren decision to control rapid growth of population. And officiallly sponsored programme of family programme has been taken to make people conscious that small family is a happy family. The Government aims at making the programme successful for a healthier and more conscious population.

Education is one of the fundamental needs. Educational and social development can make the country one step ahead in economic development. The nation should be literate. A programme of family planning can be successful only when we spread education among the mass and uplift the standard of living of the people. The Government has moved quite through literacy programme.

The world is burdened with a lot of problems. Obviously increasing population is one of them. Ti is true that population explosion is a threat and misery in a family lies in population. If the alarming growth rate is not cheeked whole human race will be endangered.

AMBITION

3) Answer any three of the following :-

d) What were the jobs that Ruskin Bond could do?

Ans.-The author could type draft job applications for everyone help lovesick students writing passionate letters to girls, make his own bed walk great diatances and pay for the cheat.

e) What did Mrs. Singh tell Ruskin Bond about the Munjia?

Ans-Some of the author's friends made their future shining while some of them had not happy endings. The author flourished himself in the field of publishing books.But neither many people heard of him nor he earned much money. He was not interested to games and sports and could not perform some works. Lack of efforts in performing the works made Bond's friends to think him an impractical person.

The author Ruskin Bond was good at putting pen to paper. He could write fairly well for everyone.

i) What did Subhas Bose's father ask him to do?

Ans.-Subhas Chandra Bose's father asked him to go to England to take preparation there for the Indian Civil service. Subhas made plans about researches in Psychology but his father suggestion obliged him to put aside his plan. He was dead against accepting a job under the British Government. He knew that he would not pass the examination due to shortage of time in his hand. He was given twenty four hours to decide but he made up his mind to go to England within a few hours.

4. School Life (Short Essay)

My high school days are nearly over. But whenever I think about my school life which spans over a period of ten years, I always remember my first day in school. I was very much afraid. Father mother accompanied me to school. But when they departed I stated crying. But the madam who was in the class took me in her arms and began to pat me on my back with sweet words. Several others were also cry. The teachers consoled all of them. But later I become very familiar with the school, teachers and my classmates. I took part in all the function like Saraswati Puja, school spots and even in serving the midday meals. Once the teachers took us to Kolkata for a tour to the zoo, museum and in the science city. It is still a very memorable day for me. But the years rolled over fast and soon the day to part with the school came. Many of my classmates went with me in the same high school but I parted with my beloved school and teachers in tearful eyes. But after so many years only the sweet recollections of my placid and happy school days remain at the core of my heart.

5. Dialogue:

Are you not sure about what profession you should choose after finishing college education and want your father's advice. Write a dialogue between yourself and your father.

Father : My son, It's high time that you should think of choosing a career for you.

Son : Why don't you choose one for me, father? You've seen life from many aspects and I know a Little of it.

Father : My boy, that may be so. But every man has his own bent of mind. And one should follow his own mind. Otherwise he may cut a sorry figure in life.

Son : If you say no, I should like to be a doctor.

Father : Is it? Are you tempted by the huge money a doctor earns, my boy?

Son : Quite opposite, father I don't think money is the sole aim of life. I want to live for an ideal. If I be a doctor, I shall have opportunities to serve people in their sufferings.

Father : That's what people say before they get into their profession. But when they are in it, they run after money.

Son : That may be so in most cases. But I can say for myself. My heart bleeds when I see the poor people dying for want of proper treatment. If I ever get a chance, I shall involve myself in the service of the suffering humanity.

Father : May God grant you the chance you are looking for.

6. Grammar:

(a) Sita went out to buy stamps.
(b) forbidden
(c) Prohibited
(d) have examined
(g) a
(i) Was he not driving his car ?
(J) out.

AMBITION

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলনপত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪ ও জুন ২০১৫

ভিত্তিমূলক পাঠক্রম (Foundation, FHS)

মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান

(Foundation Course in Humanities & Social Science)

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ-

ক) সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ যন্ত্রের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা কিভাবে প্রস্তরযুগ (প্রাচীন ও নব্য), তাম্রযুগ ও লৌহযুগ-এর বিভাজন বিভিন্ন স্তরে সাজিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ- প্রাচীন প্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে। এই যুগের মানুষ সম্পূর্ণভাবে শিকার মাছধরা এবং খাদ্যসংগ্রহের মাধ্যমে জীবন ধারণ করত। এই সময় এরা তীক্ষ্ণ ধারালো যুক্ত পাথর দিয়ে পশু শিকার করত। এই সময় মানুষ বড় বড় পাথর দিয়ে তীক্ষ্ণ ফলা তৈরি করা ছাড়াও কাঠের মগুরের সাহায্যে সরু ফলা তৈরি করতে মানুষ শিখেছিল।

নব্যপ্রস্তর যুগ ঃ নব্যপ্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল দশ থেকে বারো হাজার বছর আগে। এই যুগের মানুষ শুধু পশু শিকারই করত না, এরা বাড়ীতে পশুপালন করতে শিখেছিল। তারা খাদ্যউৎপাদন করতে শিখেছিল। এই যুগের সংস্কৃতিকে মর্গ্যান 'বর্ব্বর যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। এই যুগের মানুষ মাটির বাসন তৈরি করতে শিখেছিল। তারা রেশম থেকে সুতো বার করতে শিখেছিল। তার সঙ্গে তারা গাছের বাকলকে পোশাক হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছিল। এই সময়ের অস্ত্রগুলি ছিল উন্নতমানের। ধারালো পাথরের কুঠার, পাথর দিয়ে ফলা বানিয়েছিল। এছাড়া কাস্তে খাঁজ, কুড়ুল ইত্যাদি অস্ত্র বানিয়েছিল নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ। এই অস্ত্রগুলির সুন্দর সুন্দর হাতল লাগিয়ে ছিল পশুর হাড় বা গাছের ডাল দিয়ে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের তুলনায় নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্রগুলি ছিল ধারালো ও মসৃণ এবং সুন্দর।

তাম্রযুগ ঃ অস্ত্র নির্মাণে পরবর্তী বিপ্লব আসে পাঁচহাজার বছর আগে তাম্রযুগে। এই সময় মানুষ অনেক উন্নত হয়েছিল। তখন তারা নগরকেন্দ্রিকভাবে বসবাস শুরু করেছিল। তাই এইসময় মানুষ তার জীবকা অনুসারে সমাজে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। যেমন ছিল কুশলী মিস্ত্রী, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, লিপিকার শ্রেণি প্রভৃতি। এইসময় মানুষ তামার আবিষ্কার করেছিল। তারা তামা দিয়ে সমস্ত রকমের অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছিল, তাই এই যুগকে তাম্রযুগ বলা হয়। এই সময় মানুষ তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ নামে একটি ধাতুর আবিষ্কার করেছিল। তাম্রযুগে মানুষ চাকার আবিষ্কার করেছিল।

এই যুগের মানুষ তামাকে গলিয়ে তামার অস্ত্র বানাতে শিখেছিল। তামাকে গরম করলে প্রয়োজন মত ধাতানো যায় এবং এবং পিটিয়ে বিভিন্নপ্রকার আকার দেওয়া যায় বা পাতে পরিণত করা যায়। তামার মধ্যে পাথর হাড় বা কাঠের সমস্ত গুণই আছে। তামা পাথরের মতোই ধারালো কিন্তু বেশী টেকসই। আবার তামার সুবিধা পাথরের থেকে অনেক বেশি। তাই তাম্রযুগে তামাকে এইরকম নানা কাজে ব্যবহার করা হত।

লৌহযুগ ঃ লৌহযুগের সূচনা হয়েছিল আনুমানিক ১২০০ খ্রিঃপূর্বাব্দ নাগাদ। লোহা, তামা ও টিনের মতো দুষ্প্রাপ্য নয়। পৃথিবীতে লোহা খুব সহজেই পাওয়া যায়। প্রথমদিকে লোহা দুষ্প্রাপ্য বস্তু ছিল। লোহা খনি থেকে এনে পিটিয়ে নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র বানানো হত। কিছুদিন পরে আর্মেনিয় পার্বত্যাঞ্চলের বর্বর উপজাতিরা লোহা গলানোর কৌশল আবিষ্কার করেছিল। এই লোহা দিয়ে মানুষ চাষের অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছিল, সেইসঙ্গে মানুষ যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র বানায়। তীরধনুক, বর্শা, লোহার তৈরী ফলা ব্যবহার করা হত। লোহার হালের সাহায্যে পাথুরে জমি ভাঙ্গতে পারত। পূর্বে উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র ছিল দামী ও দুর্লভ। লোহা আবিষ্কারের পরে এই পার্থক্যটি অনেকটাই কমে গিয়েছিল। বর্তমানের লোহার অস্ত্রশস্ত্র বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ঘ) উন্নয়ন কাকে বলে ? উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করুন ?

উত্তর ঃ- উন্নয়ণের ধারায় মানুষের সমস্ত রকম কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। এইগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংগঠন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অর্থবহ পরিবর্তনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উন্নয়ণ প্রক্রিয়ার জনগণের অংশগ্রহণ হল একটি আবশ্যিক অঙ্গ।

উন্নয়ণের ধারাকে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, পরিকাঠামো গড়ে তোলা আবিশ্যিক প্রয়োজন।

আবার অনুন্নত দেশগুলিতে সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ অথবা বর্জন করা জনগণের ওপর নির্ভর করে। প্রযুক্তির পরে ও আগে উৎপাদন, উৎপাদনের সহজলভ্যতাকে উন্নয়ণের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বলা যায়। ১৯৬০ সালে প্রযুক্তি এবং সম্পদকে উন্নয়ণের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে জনমত গড়ে তোলা হয় এবং তাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়। এর থেকে এটি উপলব্ধি করা যায় যে, উন্নয়ণের প্রক্রিয়ায় জনগণকে যুক্ত না করলে সম্পদ অথবা প্রযুক্তির হস্তান্তর একেবারেই অর্থহীন। তাই উন্নয়ণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ আবশ্যিক। জনগণ উন্নয়ণের ক্ষেত্রে চার ধরণের অংশগ্রহণ করতে পারে। সেগুলি হল ঃ-

১। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনগণের সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েদাঁড়ায়, জনগণের ধ্যানধারণা গড়ে তোলার, পরিকল্পনা রচনায়, বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে থেকে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে সাধারণ মানুষ। জনগণ আঞ্চলিক স্থানীয় প্রয়োজনকে চিহ্নিত করেই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থের ক্ষেত্রে অর্থ যোগানের ব্যবস্থা ও তার মূল্যায়ন জনগণ করে থাকে।

২। রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ঃ সম্পদ সংগ্রহ পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে জনসাধারণ তার প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রকল্পগুলিকে রূপায়িত হলে জনসাধারণই উপকৃত হয়। কারণ শেষ পর্যন্ত জনসাধারণই রূপায়ণের সুফল ভোগ করে। এইসব সুফল ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত হতে পারে। জনগণের অংশগ্রহণই কর্মসূচী এবং প্রকল্পের মূল্যায়নকে অর্থবহন করে। তাই প্রাথমিক রূপরেখাতে এই অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা দরকার।

৩/ অংশগ্রহণের ফলভোগ ঃ জনসাধারণ এই সব উন্নয়ণে যেমন অংশগ্রহণ করে, তেমনি এইসব থেকে তারা ফলভোগ করে। কোন প্রজেক্টে কতটা অর্থ লাগবে এবং সেই প্রজেক্টের অর্থ কোথা থাকে আসবে এবং যেমনভাবে আসবে তারাই নির্ধারণ করে এবং তাই প্রজেক্ট সফল হলে তার বেশিরভাগ ফলেই তারা লাভবান হবে। দেশের উন্নয়ণের সাথে সাথে তাদের সমৃদ্ধিও বাড়বে।

AMBITION

৪/ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ঃকোন প্রকল্প যদি কোন সংস্থা নিজের কয়েকজন গোষ্ঠীর মাধ্যমে অর্থ দেয় এবং সেই প্রকল্প সফল হলে তারা সেই জিনিসের মূল্য নিজেরাই ধার্য্য করে এবং তার লভ্যাংশ নিজেরা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়।

জনগণ যে কোন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আগে প্রকল্পটির বৈশিষ্ট্য এবং কাজের পরিবেশ, দুটিকেই পরীক্ষা করতে হয়। প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে জটিল কৃৎকৌশল, প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য এবং কাজের পরিবেশ সম্পদের প্রতিযোগিতা, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, সেই সময়ের প্রতিযোগিতা, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের নমনীয়তা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি। এগুলি সাধারণভাবে জনগণের উন্নয়ণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রকৃতি এবং ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রক করে।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ-

খ) বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের মনোভাব কী ছিল ?

উত্তর ঃ- ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই বর্ণবৈষম্য বিরোধী নীতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাতে অনুসরণ করে আসছে। কেননা, বর্নবৈহম্য ঔপনিবেশিকতারই একটি অংশ। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে বর্নবৈষম্যের বিরোধীতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এটিযে একটি অত্যন্ত গর্হিত সংস্কার সেটি অনুধাবন করা হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহ এবং অহিংসামূলক কর্মসূচী প্রথম মানবাধিকারের প্রশ্নটিকে সম্মুখে নিয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধিজি, বর্ণবৈষম্য অ-মানবিক অত্যাচার এবং শোষণের যে কদর্য চেহারা সেখানে দেখে এসেছিলেন সেকথা প্রচার করেন এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বর্ণবিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করার কথা বলেন। ১৯৪৬ সালে জাতিপুঞ্জের বারতবর্ষ এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলে দেয়।

১৯৪৬ সালে অক্টোবর মাসে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশনে বারতবর্ষ বর্ণবেষম্য বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে। তখনও পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের ভিতর ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহেরেই প্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ সদস্যই বৈদেশিক প্রাধান্য ও পীড়ন থেকে মুক্তি খুঁজছিল। ভারতবর্ষ উপনিবেশগুলির পক্ষ নিয়ে বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের জন্য উদ্যোগ নেয়। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনেও ভারত একই ধরণের বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকে।

জাতিপুঞ্জ ও ভারত শেষ পর্যন্ত তিনটি সূত্রের ভিত্তিতে এই আন্দোলন শুরু করে - ১) বর্নবৈষম্যমূলক নীতি কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। ২) এ ধরণের নীতি যে কোন দুটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে এটি মেনে দিতে হবে। ৩) বর্নবৈষম্যকে জাতিপুঞ্জের সনদে মানবাধিকার সম্পর্কে সার্বজনীন ঘোষণার বিরোধী বলে বিবেচনা করা হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য জাতিপুঞ্জ যাতে প্রয়াসী হয় ভারত সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ১৯৫৫ সালের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সনদে আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস সাম্য ও গণতন্ত্রের দাবি তোলে। কিন্তু ওই দেশের শাসক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা ৬৯ জন ব্যক্তিকে হত্যা করে। প্রায় ৪০০ জনকে আহত করে এবং ১৯৬১ সালে নিরস্ত্র প্রতিবাদীদের উপর গুলি চালিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিত গড়ে তোলে।

ভারতীয় উদ্যোগে জাতপুঞ্জ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে এবং সাধারণ সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের বর্ণবৈষম্য সম্পর্কিত নীতিগুলকি পরিহার করতে বাধ্য করে।

নেহেরু দক্ষিণ আফ্রিকাকে জাতিপুঞ্জ ও কমনওয়েলথ থেকে আবিষ্কারের দাবি তোলে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি পরোক্ষ বর্ণবিদ্বেষকে সমর্থন করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

১৯৬৭ সালে আপ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত নেতা হিসেবে স্বিকৃত পায়। এই সংগঠন সমগ্র এশিয়ার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। কয়েক বছর পরে ভারতবর্ষে SWAPO কে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় এবং নিজেদের বৈদেশিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে 'নেহেরু পুরস্কার' দিয়ে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।

ঙ)বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে বস্তুনিষ্ঠতার গুণ কী ?

উত্তর ঃ- বস্তু বিষয় ও ঘটনাবলীর সতর্ক পর্যবেক্ষণের উপর এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে এই পর্যবেক্ষন চালানো হয় তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার উপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ, হিসেবে, গ্রহণক্ষেত্রের গতিবিধি বহুযুগ ধরে বিশ্বের নানাপ্রান্তের লোক পর্যবেক্ষণ করছে এবং তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে এইসব গ্রহণ ক্ষেত্রের গতিবিধি সম্পর্কে এবং তাদের অবস্থান, গতির দ্রুততা এবং তাদের অবস্থান, গতির দ্রুততা এবং তাদের গতিপতের নিয়ম বা অনিয়ম সম্পর্কে হিসেবনিকেশ করা যায়। অন্য এক উদাহরণের কথাও বলা যায়। যখন কেউ অসুস্থ হয়, তখন রোগের সব লক্ষনগুলো ভাল করে লক্ষ্য করা হয় এবং যদি কোন পথ্য, ঔষধ বা চিকিৎসায় রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে অথবা অধিকতর অসুস্থ হয় তাও তথ্যাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পর্যবেক্ষনকে অতি অবশ্যই পুরোপুরি তথ্যনির্ভর হতে হয়, অর্থাৎ যা পর্যবেক্ষন করা হচ্ছে সে বিষয়ে যদি প্রচলিত কোন বিশ্বাস থাকে তা যেন পর্যবেক্ষণধারাকে প্রভাবিত না করে। যদি পর্যবেক্ষকেরও কোন ব্যক্তিগত ধারণা বা সংস্কার থাকে তাকেও সরিয়ে রাখতে হবে। এইরকম বস্তুনিষ্ঠার ফলে পৃতিবীর নানাস্থানে কোন একটি রোগের নানা পর্যবেক্ষক একই জাতীয় সিদ্ধান্তে এসে থাকে। এ থেকে অর্জিত জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানাধরনের হতে পারে, যার মধ্যে দিয়ে অথবা তাকে পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে পাঠিয়ে তার আচরণ পর্যবেক্ষন করা।

বৈজ্ঞানিক কাজের ক্ষেত্রে সাধারণত আর এক দফা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে যার সাহায্যে কোন সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ বস্তুর আচরণ সম্বন্ধীয় যথার্থ সূত্র গড়ে তোলার আগে, অনুসিদ্ধান্তগুলোকে যাচাই করে নেওয়া হয়।

AMBITION

চ) রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য কী ?

উত্তর ঃ- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির কথা উল্লেখ করা আছে। এই নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের রাজনৈতিক এবং নৈতিক পরিসরকে নানাভাবে বাড়িয়েছে, সংবিধানের ১৯নং ধারায় বলা হয়েছে নির্দেশমূলক নীতিগুলি ব্যক্তির অধিকার ও সুযোগ -সুবিধা বৃদ্ধি করতে এবং মূল্যবোধকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে রাষ্ট্রের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এই নির্দেশমূলক নীতিগুলির জন্য প্রত্যেকের সমান কাজের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের সমানা বেতন, শৈশবে ও যৌবনে শোষণ ও নৈতিক ও পার্থিব দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য ঃসংবিধানের চতুর্থ অংশের অন্যান্য ধারাগুলির নির্দেশ হল — বেকার অবস্থায়, বার্ধক্য ও অসুস্থতার নাগরিকরা যাতে রাষ্ট্রের সাহায্য পায় তারজন্য রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠিত করতে হবে। যেগুলি স্বায়ত্বশাসনের একক হিসেবে কাজ করবে। সকল শ্রেণির শ্রমিকদের জন্য জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী, নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ণ করতে এবং অবসর উপভোগ করতে পারে রাষ্ট্রকে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক ঘোষণার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে সংরক্ষিত করা, গো-হত্যা নির্ধারণ করা, যাতে সমগ্র দেশে একই দেওয়ানী আইন চালু থাকে। দুর্বল শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগতস্বার্থের উন্নতি বিধান, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করাও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য।

রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় পরিষ্কার জানা যায় যে, রাষ্ট্র যদি সঠিকভাবে প্রত্যেকটি নীতিকে অনুসরণ করে, তাহলে এটি একটি কাল্পনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক পুর্নাঃসম্পন্ন স্বর্গে পরিণত হবে।

তাহলে বলা যায় যে, এই ধরণের উপদেশগুলি প্রায় অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এই উপদেশ, ইচ্ছা বা আকাঙ্খা –এসব কিছুই আমাদের আয়ত্বের বাইরের। নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য হল এই যে, এইগুলি রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ধারণের মাপকাঠি, কিন্তু এখানে একটা ভয় থেকে যায় যে যদি রাষ্ট্রের প্রতি এই উপদেশগুলিকে জনসাধারণ রাষ্ট্রের মিথ্যা অঙ্গীকার বলে মনে করলে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে যাবে, আর রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ-

ক) সরল সমাজ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ- এই পৃথিবীতে যখন প্রথম বনমানুষ থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়, তখন সেই মানুষ সমাজকাল বলে তা জানত না। সমাজ কিভাবে গড়ে তুলতে হয় তাও সে জানত না। ক্রমশঃ মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিনটি জিনিসের খুবই প্রয়োজন দেখা দেয়। খাদ্যের সন্ধানে মানুষ একসময় চারদিক ঘুরে দিনের শেষে কিছু খাবার নিয়ে ঘরে ফিরেছে। এরপর মানুষ উলঙ্গ অবস্থা থেকে গাছের ছাল বা অন্য কিছু দিয়ে বস্ত্র তৈরির চেষ্টা করেছে। তারপর মানুষ দেখল গাছের ডাল বা বনে -জঙ্গলে এখানে ওখানে রাত কাটানো ঠিক নয়। তখন মানুষ বাসস্থান নির্মাণ করল। কিন্তু মানুষ দেখলো একা সমস্ত কাজ করা সম্ভব নয়। তাই তারা পাশাপাশি ঘর নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করল এবং নিজেদের প্রয়োজনে প্রত্যেকের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিল। এইভাবে পাশাপাশি বসবাস করতে করতেই এক একটি সমাজের জন্মনেয়। কিন্তু সেই সমাজ এখনকার সমাজের মতো জটিল ছিল না। সেই সমাজে প্রত্যেক মানুষ তাদের প্রয়োজন সহজেই মেটাতো। এই সমাজকে আমরা 'সরল সমাজ' বলে থাকি। এই সমাজ বর্তমানে আর নেই।

চ) তফশিলি জাতির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ?

উত্তর ঃ-তফশিলী জাতি বলতে সেইসব সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যদেরকে বোঝায় যারা হিন্দু বর্ণাশ্রমের সবচেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থিত, তারফলে এরা নানা ধরণের শোষণের শিকার হয়েছিল। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অনগ্রসর শ্রেণির বিকাশের জন্য সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। ১৯০১ সালের পর থেকে হিন্দু আধিপত্য সামাজিক সংস্কারকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যায়।

১৯০৮ সালের পর বিভিন্ন লেখক মনে করেন যে, অস্পৃশ্যরা সংখ্যায় ৫ কোটি বা তার বেশি। ১৯১১সালের আদমসুমারী অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ অথবা সমগ্র জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ হল অস্পৃশ্য। ১৯৩৫ - ৩৬ সালের ভারত শাসন আইনানুযায়ী নির্বাচনে প্রতিনিধিত্বকরার বিধিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তফশিলী জাতিদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী অস্পৃশ্যদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভা তফশিলীজাতি সংক্রান্ত একটি আদেশ প্রদান করে যা মূলতঃ ১৯৩৬ -এর তালিকার সমতুল্য। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী তফশিলী জাতির জনসংখ্যা ৫ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ কোটিতে।

তফশিলী জাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভিত্তি হল জাত, একটি জাতি ও একটি রাজ্যে তফশিলীভুক্ত হতে পারে। আবার, অন্য প্রতিবেশি রাজ্যে তা নাও হতে পারে। তফশিলী জাতির জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশই দরিদ্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তফশিলী জাতির ৫২ শতাংশ হল ভূমির সঙ্গে জড়িত শ্রমিক, ২৮ শতাংশ হল কৃষক (মূলতঃ ক্ষুদ্র চাষী)। পশ্চিম অঞ্চলে অধিকাংশ তাঁতি তফশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত, আর পূর্বাঞ্চলে সব মৎস্যজীবিরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

ছ) কল্যাণমুখি রাষ্ট্র কী ?

উত্তর ঃ-বহু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রই এই কল্যাণমুখী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন শুরু করে। সরকার হস্তক্ষেপমূলক নীতি ছাড়াও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সমস্ত ঋণাত্মক প্রভাব অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয় তা দ্রবীভূত করার দৃষ্টিভঙ্গিই মূলতঃ ব্যাপক অর্থে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনের অভিলক্ষ্য, পশ্চিমের উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সরকার বয়সকালীন নিরাপত্তা, বেকারদের, সুবিধা দান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক সেবামূলক কারণে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করে থাকে। এই সমস্তকে এককথায় সামাজিক নিরাপত্তা বা কল্যাণমুখী ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। এই সমস্ত সুবিধা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন আছে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিকাশের একটি অন্যতম বিরুদ্ধ ফলাফল হচ্ছে পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের ভারসাম্য যাতে সুরক্ষিত হয় তার উপযুক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের সুনিশ্চিত করা। মুক্ত বাজার ব্যবস্থা, মুনাফার অভিলক্ষ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুনিশ্চিত এবং তা সততই সংশয়মুক্ত। এটি তাই আরও একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যা থেকে আমরা পরিকল্পনার প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে পারি।

জ) সংস্কৃতায়ণ বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ- এম. এন. শ্রীনিবাসের বর্ণনায় এই সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়া জাতিগোষ্ঠীগুলির, যেমন - উচ্চতর জাতিগোষ্ঠী এবং নিম্নস্থ জাতিগোষ্ঠীগুলির আচরণগত কর্মকাণ্ড এবং জীবনধারাও আদর্শকে গ্রহণ করে জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চতর মর্যাদালাভের দাবীকেই উল্লেখ করে। নিম্নজাতের, উচ্চতর জাতের মর্যাদা লাভের এই যে প্রক্রিয়া, যা আদমসুমারীতে দেখা গেল, তা 'সংস্কৃতায়ণ' নামে এক বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। আদমসুমারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতপাতের শ্রেণী কাঠামোর মধ্যে শুধু যে উচ্চতর জাতের মর্যাদা পাওয়ার দাবি এবং প্রতি - দাবিসংক্রান্ত বেশ কিছু মামলা চলছিল তা নয়, এই ধরণের দাবি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জীবনধারার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলতঃ এর মানে দাঁড়ায় তাঁদের নিজস্ব প্রথা, আচার -অনুষ্ঠান এবং জীবনধারা বর্জনীয়।কারণ, সেগুলি নিম্নমানের। 'সংস্কৃতায়ণ' মর্যাদার গতিশীলতার মাধ্যমে নিম্নস্থ জাতগোষ্ঠীর উচ্চতর জাতের মর্যাদালাভের আকাঙ্খাকেই প্রতিফলিত করে। নতুন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত সামাজিক ও প্রশাসনিক পটভূমিকার মধ্যে ও প্রক্রিয়া তার উদ্দীপনা সংগ্রহ করে। ফলে জাত সনাক্তকরণ প্রচেষ্টা এক নতুন অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে। ১৮৮৫ সালে এইচ. এইচ. রিসলে ভারতবর্ষে জাতপাত -সম্পৃক্ত সামাজিক জাতি পরিচায়ক, সাংস্কৃতিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলির চিহ্নিতকরণের তালিকা তৈরি করেন। এই প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে আদমসুমারীর সুচনা করে। এই প্রথম জাতপাতকে এক সামাজিক অস্তিত্ব হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।।

AMBITION

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলনপত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪ ও জুন ২০১৫

Environmental Studies

আবশ্যিক পাঠক্রম (Compulsory Course)

১। সঠিক উত্তরটি '√' চিহ্নিত করুন ঃ-

a) ISI মান অনুসারে দ্রাব্য অক্সিজেনের (Do) সর্বোচ্চ অনুমোদন সীমা হল
3.0 ppm

b) জলাভূমি অঞ্চলে বা জীবদেহের পচনের ফলে .....গ্যাস সৃষ্টি হয়।
CH_4

c) বিশুদ্ধ পানীয় জলের pH হল।
7

d) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৮-৫০ কিলোমিটার উচ্চাতায় বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলীয় স্তরকে.....বলা
শান্ত মণ্ডল

e) কোন ভাইরাস থেকে এডস (AIDS) হয় ?
HIV

f) বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ সর্বদাই
একমুখী

g) জিয়ার্ডিয়া রোগের বাহন জীবাণু হল
প্রোটোজোয়া

h) ভুপাল গ্যাস দূর্ঘটনায় যে গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটি হল ?
মিক

i) জাপানী এনকেফেলাইটিং.....বাহিত রোগ
মশা

j) .....অমরাবতী .....নর্দমা নদীর উৎস স্থল

২। যে কোনো দশটি প্রশ্নের প্রতিটির উত্তর প্রদত্ত চারটি লাইনের মধ্যে লিখুন ঃ

a) পরিবেশের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা লিখুন-

উত্তর ঃ-জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণি তাদের জীবনচক্রের যে কোন সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলা হয়।

অথবা,

জৈব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব ও প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলা হয়।

d) সিয়াল স্তর কাকে বলে ?

উত্তর ঃ- ভূ-ত্বকের উপরি অংশে গ্রানাইট জাতীয় লঘু আল্পিক শিলা দ্বারা গঠিত স্তরকে সিয়াল স্তর বলে। এই স্তরের মূল উপাদান হল সিলিকা (Silica) এবং অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকা আর অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা গঠিত বলে এই স্তরের নাম হয়েছে সিয়াল (Sial)

f) জলচক্র কাকে বলে ?

উত্তর ঃ-জল একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন প্রথম তরল পদার্থ। বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপন – এই তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরামহীনভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। প্রথম প্রক্রিয়ায় বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ভূ -ভাগের ও জলভাগের জল আকাশে উঠে যায় জলীয় বাষ্পরূপে। অনুকূল পরিবেশে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি বা তুষার আকারে পৃথিবীতে অধঃক্ষেপিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে জলচক্র বলা হয়।

g) ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন দূষণের প্রধান উৎস কী ?

উত্তর ঃ-আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ওজোন স্তর ধ্বংসকারী ক্লোরিণ পরিমাণুর প্রধান উৎস হচ্ছে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা C.F.C. (Chloro -Fluro Carbon) যৌগ। এই রাসায়নিক যৌগ ফ্রেয়ন গ্যাস নামে পরিচিত। এরা তিন প্রকারের হয়, যথা – ফ্রেয়ন ১১ বা CFCL, ফ্রেয়ন ১২ বা CF_2Cl_2 এবং ফ্রেয়ন ১৩ বা CF_2CL- CFC_{12} ।

C.F.C.-র উৎসগুলি হল - হিমঘর, ফ্রিজ, মোটরগাড়ি এবং প্রসাধন জাতীয় স্প্রে।

J) জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র কাকে বলে ?

উত্তর ঃ-যে চক্রাকার পথে জীব দেহ গৌন উপযোগী রাসায়নিক মৌলগুলি (C. H. O. N. ইত্যাদি) পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীব দেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়, তাকে জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলে।

k) এলনিনো কি ?

উত্তর ঃ-স্পেনীয় ভাষায় 'এলনিনো' শব্দের অর্থ হল শিশু যীশুখ্রিস্ট। এই বিপর্যয় বড়দিনের সময় হওয়ায় ইহার এরূপ নামকরণ। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের চিলি, পেরু, সংলগ্ন উপকূল বরাবর, মাঝে মাঝে অস্থির ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির দক্ষিণমুখী উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের আগমনই 'এলনিনো' নামে পরিচিত।

m) কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসের উৎস কী ?

উত্তর ঃ-বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদানগুলির মধ্যে CO_2 গ্যাসের গুরুত্ব ব্যাপক। কারণ, এই গ্যাসের অতি মাত্রা এবং অল্পমাত্রা দুটোই ক্ষতিকারক। আবার এই গ্যাস ছাড়া জীব জগৎ চলতে পারে না। এই গ্যাসের উৎসগুলি হল - ১) জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানি যেমন-খনিজ তেল, . কয়লা প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে। ২) শিল্প কারখানা ও মোটর গাড়ি ব্যবহারের ফলে। ৩) সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা থেকে, ৪) অরণ্য সংহার ও সবুজ নিধনের ফলে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

n) অ্যারোসল কাকে বলে ?

AMBITION

উত্তর ঃ-বায়ুমণ্ডলের অন্য একটি উপাদান হল ধূলিকণা, মরুঅঞ্চল ও সমুদ্র তীরের অতি সূক্ষ্ম ধূলো, বালি, অতি ক্ষুদ্র খনিজ লবণ, বিভিন্ন কলকারখানার পোড়া কয়লার ছাই, আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত ছাই, ভস্ম প্রভৃতি ধূলিকণা রূপে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। এদের একত্রে অ্যারোসল (Aerosol)বলা হয়।

q) চিপকো আন্দোলন কী ?

উত্তর ঃ- চিপকো কথাটির অর্থ হল 'আলিঙ্গন ঃ, ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর প্রদেশের তেহরী গাড়োয়াল অঞ্চলে এই আন্দোলনের সূচনা হয়, বিত্তবান ঠিকাদার এবং শিল্পপতিদের নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস এবং সম্পদ লুন্ঠনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। রাতের অন্ধকারে ঠিকাদারের লোকেরা গাছ কাটতে এলে আদিবাসী মায়েরা প্রতিটি গাছকে সন্তানের মতো জড়িয়ে থাকেন এবং রাত জেগে গাছ পাহারা দিয়েছেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সরলা বেন, মীরা বেন প্রমুখরা। চিপকো আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষনের জন্য হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ নিধন নিষিদ্ধ করা।

r) শিয়াল ও সীমার পার্থক্য নিরূপণ করুন ?

উত্তর ঃ-

১। ভূ-ত্বকের উপরিভাগে হাল্কা গ্রানাইট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত অংশকে সিয়াল এবং ভূ-ত্বকের নীচের অংশের ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত অংশকে সিমা বলে।

২। সিয়াল সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা গঠিত সীমা সিলিকা এবং ম্যাগনেশিয়াম দ্বারা গঠিত।

৩। সিয়ালের আপেক্ষিত গুরুত্ব ২.৭৫-২.৯৫।

৪। সিয়াল স্তরে 'P' তরঙ্গের গতিবেগ 7km/sec..

৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন যে কোনো পাঁচটি ঃ

a) মৃত্তিকা অবনমনের কারণ

পৃথিবীর একভাগ স্থল, তিনভাগ জল। এই স্থলভাগের উপরই মানুষ ও অন্যান্য স্থলবাসী জীবের অবস্থান। ভূমির গুণগত মানের [redacted] প্রতিপালনের জন্য যে স্বচ্ছ কাঁচের ঘর থৈরী করা হয় তাকে গ্রীন হাউস বলে। সমগ্র পৃথিবীর পরিমণ্ডল ও একটি বড় গ্রীন হাউস এবং বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসগুলি অবলোহিত রশ্মিগুলিকে শোষন করে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণতর রাখে। এক্ষেত্রে গ্যাসগুলি কাঁচের আস্তরক হিসাবে কাজ করে, কিন্তু মানুষের কার্যকলাপের ফলে এই গ্যাসগুলির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি জনিত নানান দূর্ঘটনাকে একসাথে 'গ্রীন হাউস প্রভাব' বলে।

e) তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলন ?

উত্তর ঃ-২৬০.৫ মিটার উচ্চ তেহরী বাঁধ নির্মাণ বাঁধ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয় সোভিয়েত আর্থিক সহযোগিতায়। এরফলে ২৭০০০০ হেক্টর জমিতে নতুন করে সেচের ব্যবস্থা হবে। ৬৪০০০০ হেক্টর জমির বর্তমান সেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে এবং ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।

১৯৭৭ সালে এই বাঁধের কাজ শুরু হলে প্রকল্পটির বিরোধীতায় তেহরী বাঁধ বিরোধী সব গ্রাম সমিতি গঠিত হয়। তাদের মতে, এই বাঁধ নির্মাণে সুফল অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। প্রকল্পটির ফলে ৮৫০,০০০ মানুষ গৃহহীন হবে এবং তেহরী শহর ও পার্শ্ববর্তী ১০০টি গ্রাম জলমগ্ন হবে। জলাধারে বিপুল পরিমাণ জলের চাপ ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া হরিদ্বার, ঋষিকেশ, দেহপ্রয়াগ প্রভৃতি ধর্মীয় শহর ধ্বংস হবে এবং বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি জলে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরলাল বহুগুণা এই বাঁধের বিরোধিতায় বেশ কয়েকবার অনশন করেন।

g) ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা।

উত্তর ঃ-১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোম শহরে মানব পরিবেশ শীর্ষক সম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়ণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক সফল উদ্যোগ শুরু হয়। পরিবেশ ও উন্নয়ণ সম্পর্কে ১০৯টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে স্থাপিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ণ সংক্রান্ত বিশ্ব কমিশন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ব্রান্টল্যাণ্ড। তার নাম অনুসারে এই কমিশনের নাম হয় ব্রান্টল্যাণ্ড কমিশন। এই কমিশন আমাদের সাধারণ ভবিষ্যত শীর্ষক প্রতিবেদনে দু'টি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এগুলি হল ঃ–

১।পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রাখা, এবং

২।পরিবেশের গুণগত মান অপরিবর্তিত রেখে মানুষের জীবন ধারণের মানোন্নয়ণে যত্নশীল হওয়া।

১৯৯১-তে কেয়ারিং ফর দ্য আর্থ এবং ১৯৯২-এ বসুন্ধরা সম্মেলনে।

এখানে পরিবেশের উন্নয়ণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হয়, যেমন —

১।যা টিকিয়ে রাখা যায় কয়েক প্রজন্ম ধরে।

২।যার একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

৩।যা বর্তমানের জন্য হলেও ভবিষ্যতের জন্য কোন ক্ষতি করে না।

৪।যা বিশেষ করে পৃথিবীর গরীব মানুষের চাহিদা পূরণের দিকে বেশি নজর রাখে।

৫।সাংস্কৃতিক ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপকরণে যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করে।

AMBITION

h) বিশ্ব উষ্ণায়ন ?

উত্তর ঃ-ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মানে আসার পর পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক মাত্রা হল 15^0C । এই তাপমাত্রা সূর্য থেকে আগত এবং পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত সৌর কিরণের ভারসাম্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে এই স্বাবাবিক উষ্ণতাধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। ১৮৮০-১৯৮০ এই ১০০ বছরে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা 0.6^0C বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা অণুমান করছেন যে ২১০০০ সাল নাগাদ এই উষ্ণতা সর্বনিম্ন আরও 1.4^0C এবং সর্বোচ্চ 5.8^0C বাড়বে, উষ্ণতার ক্রমবর্ধমান হারের কারণে, সারা পৃথিবীর এই গড উষ্ণতার ক্রমবর্ধমান অবস্থানকে বলা হয় বিশ্ব উষ্ণায়ণ।

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলনপত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪ ও জুন ২০১৫

ভিত্তিমূলক (Foundation)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (FST : Foundation Course in Science & Technology)

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন (উত্তর ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়)

খ)অ) মৃত্তিকা লবণাক্ত ও ক্ষারীয় হবার কারণ উল্লেক করুন। এইমৃত্তিকা কৃষিকাজের পক্ষে অনুকূল নয় কেন ? কীবাবে এই মৃত্তিকা সংশোধন করা সম্ভব ? পশ্চিমবঙ্গের কোথায় লবনাক্ত মৃত্তিকা দেখতে পাওয়া যায় ?

উত্তর -মৃত্তিকা লবণাক্ত হবার কারণ- অত্যাধিক জলসেচের ফলে এই মাটি অধিক মাত্রায় লবণাক্ত হয়ে পড়ে এবং জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এধরনের মাটি সাধারণত মরু অঞ্চলে লক্ষ্যণীয়।

মৃত্তিকা ক্ষারীয় হবার কারণ- অতি শুষ্ক ও বৃষ্টিপাতহীন পরিবেশে এই মাটি স্থানীয় ভাবে ক্ষারীয় হয়ে পড়ে। ফলে মাটির উৎপাদনশীলতার হ্রাস পায়।

মৃত্তিকা কৃষিকার্যের পক্ষে অনুকূল কারণ, লবণাক্ত মৃত্তিকাতে জৈব পদার্থের ভাগ কম থাকে। তাই এই মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর হয়। বালির বাগ বেশী থাকায় এই মাটির জল ধারন ক্ষমতাও বেশ কম। যথোপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই মাটিতে ফসল ফলানো সম্ভব। যা সম্ভব নয়, তাই জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

ক্ষারীয় মৃত্তিকা সাধারণতঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি দিয়ে গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল ও গুজরাটের উপকূলবর্তী বদ্বীপ অঞ্চলেও এই মাটি দেখা যায়। অতি শুষ্ক ও বৃষ্টিপাতহীন পরিবেশ থাকায় এই মাটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গীয় সমভূমিতে। লবণাক্ত মৃত্তিকা দেখতে পাওয়া যায়।

আ) শিল্পবিপ্লব ইউরোপীয় সমাজে কি প্রভাব ফেলেছিল ?

উত্তর ঃ-অষ্টাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে পণ্য উৎপাদনের মন্থর ও ক্রমিক পরিবর্তনের স্থানে এল দ্রুত পরিবর্তন। নতুন যন্ত্রকৌশল সৃজনেও সেগুলির প্রয়োগের ফলে উৎপাদন পদ্ধতিতে বিরাট রূপান্তর ঘটল। শিল্পবিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পের চাহিদা যেমন বাড়ছিল, তার পূরণের জন্য দ্রুত পুরাতন শিল্প বিস্তারলাভ করতে পারছিল না।

বস্ত্রশিল্প অন্যান্য শিল্পেরও বিকাশের বিষয়ে পথ দেখাল। বস্ত্রশিল্পের ও বস্তর পরিমার্জনের যন্ত্রপাতির বাজার লৌহ ও রাসায়নিক শিল্পগুলিতে উদ্দিপণা যোগাল। এইসব শিল্পের জন্য কয়লার ক্রমবর্ধমান সরবরাহের প্রয়োজন হল। যার ফলে খনিশিল্প ও পরিবহনে নতুন নতুন বিকাশের প্রয়োজন হল। কয়লা অঞ্চলগুলিকে ঘিরে নতুন যান্ত্রিক শিল্পের বিকাশ ঘটল। বাণিজ্য চালানোর জন্য যানবাহন ও যোগাযোগের সম্পূর্ন নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। রেলপথ শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করল।

শিল্পায়নের আরও একটি দিক ছিল, উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পেল। পণ্যবস্তু যেহেতু বিরাট মাত্রায় উৎপাদিত হল, সাধারণ বা ওভারহেড ব্যয় সেই অনুপাতে বৃদ্ধিপেল না। কাজেই উৎপাদিত পণ্য সস্তা হয়ে গেল। ফলে দেশের পণ্যসামগ্রী উপনিবেশ গুলির বাজার ছেয়ে ফেলল এবং স্থানীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল।

ঘ)অ)শব্দদূষনের উৎসগুলি কী কী ? মানবদেহে শব্দদূষণের প্রভাব কী ? এটি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?

উত্তর ঃ- i) রাতের বেলায় নির্জন ও নিস্তব্ধ এলাকা। (ডেসিবল-২০)

ii) পাঠাগার (যেখানে মানুষ সাধারণত উচ্চস্তরে বাক্যস্বর বাক্যলাপ করে না) (ডেসিবল - ৪৪)

iii) সাধারণের কথাবার্তা (ডেসিবল (৪৫-৫৫)

vi) রেডিও-র আওয়াজ (ডেসিবল - ৫০-৬০)

v) মোটর সাইকেল বা কারখানার অস্বস্তিকর শব্দ (ডেসিবল-২০০)

iv) জেট ইঞ্জিনের কষ্টর আওয়াজ (ডেসিবল - ২২০)

এই শব্দদূষণ হ্রাস ও নিয়ন্ত্রন করা যাবে কীভাবে ? উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা যানবাহন ও কারখানার যন্ত্রাদির ভাল অবস্থা বজায় রেখে অবাঞ্ছিত শব্দ হ্রাস করা সম্ভব। নানা উৎসব ও সমাবেশে দিনে ও রাত্রিতে লাউড স্পীকারের ব্যবহার সমগ্র এলাকায় দুর্বিষহ আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এ ধরনের শব্দদুষণ রোধে প্রবর্তিত আইন কানুন ও নির্দেশিকা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় গাছপালা শব্দ শোষন করে সুতরাং কর্মব্যস্ত সিল্প বাণিজ্য এবং আবাসিক এলাকায় রাস্তার দুধারে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৮০ ডেসিবেল-এর অধিক প্রাবল্য যুক্ত শব্দ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। সাধারণত দীর্ঘ সময় যাবৎ ৮০-৯০ ডেসিবেল শব্দের মধ্যে থাকলে শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে। শব্দ দূষণ শারীরিক ও মানসিক, দু'দরণের ক্ষতিই ঘটাতে পারে। অতি প্রবল ও দীর্ঘ স্থায়ি শব্দ যেমন হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে তেমনি আকস্মিক প্রবল শব্দ মানুষের ভীতি দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে। মাথাধরা, ক্লান্তি, অনিদ্রা, বমির উদ্রেক প্রভৃতি শব্দ দুষণের ফলে দেখা দিতে পারে।

আ) গণসংযোগের মাধ্যম হিসাবে রেডিও এবং সংবাদপত্রের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।এছাড়া আদেরা চারটি গণসংযোগের মাধ্যম উল্লেখ করুন ?

উত্তর ঃ- আমাদের দেশে বেতার সম্প্রচার বেসরকারীভাবে শুরু হয় ১৯২৭ সালে। সরকারীভাবে ১৯৩০ সালে। তাই আকাশবানীর ইতিহাস প্রায় ৭০ বছরের পুরানো। বেতার সম্প্রচারের এই প্রসার কার্যকারিতার পেছনে ষাটের দশকের ট্রানজিস্টার বিপ্লব নামে পরিচিত ঘটনাটির বড় ভূমিকা রয়েছে। কারণ এর ফলে বেতার গ্রাহক যন্ত্র বা রেডিও সেট যথার্থই সস্তা এবং বহনযোগ্য হয়ে ওঠে। সমস্ত ট্রান্সমিটার থেকে সম্প্রচারিত সব কার্যক্রমের দৈনিক প্রসারকাল যুক্ত করলে তা দাঁড়াবে ১৫০০ ঘন্টারও বেশী। এই অনুষ্ঠানে সবক'টি জাতীয়ভাষা এবং বহুভাষা ব্যবহৃত হয়। মহিলা ও গ্রামীন জনসাধারণের জন্য অনুষ্ঠান ৬০টিরও বেশী কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। অনেকগুলি কেন্দ্র থেকে যুবক-যুবতীদের বা শিশুদের কিংবা অন্য কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এখন রেডিও সেট তুলনায় দামী নয় এবং বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াও ড্রাইসেল দিয়ে চালানো সম্ভব। এই সমস্ত কারণে এদেশে গণমাধ্যম হিসেবে আকাশবাণীর ব্যপ্তি সর্বাপেক্ষা বেশী।

সংবাদপত্র ঃ- যোগাযোগ ব্যবস্থায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের গুরুত্ব অপরীসীম। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের

AMBITION

সংখ্যা ১৯৯৫ সালে ছিল প্রায় ৩৭ হাজার। অবশ্য যোগাযোগের ব্যাপারে সংবাদপত্রের কার্যকরিতার মূল্যায়ণের সময় দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথম, কেবলমাত্র সাক্ষর মানুষই সংবাপত্র পাঠের সুবিধা পেতে পারেন, যদিও কিছু ক্ষেত্রে সাক্ষর মানুষেরা অন্যদের তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, দুর্গম ও দূরাঞ্চলে পরিবহনের অসুবিধার জন্য সংবাদপত্র পৌঁছে দেওয়া শক্ত। তাই সংবাদপত্রের প্রচার মূলত বড় বড় মহানগরী ও শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। তবে আমাদের সমাজে চাপানো বিষয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যন্ত বেশী। মানুষ এসব বিষয় বিশেষ বিবেচনা না করেই বিশ্বাস করেন। তাছাড়া সংবাদপত্রের অধিকাংশই সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকায় মানুষের কাছে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতাও তুলনামূলকভাবে বেশী।

এ দুটি ছাড়া আরো চারটি গণসংযোগের মাধ্যম হল -দূরদর্শন, সাময়িক পত্র, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন (উত্তরর ১২০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়) ঃ-

খ) সামরিক প্রযুক্তি ও জাহাজ নির্মাণের কারিগরিতে মধ্যযুগের ভারতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলির বিবরণ দিন ?

উত্তর ঃ-সামরিক প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই ভারতে অশ্বারোহীদের জন্য দড়ি ও কাঠের রেকার প্রচলিত ছিল। এটি অশ্বারোহীদের যুদ্ধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একই সাথে নালের ব্যবহার ঘোড়ার কর্মক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়।

কামান ও বারুদের ব্যবহার সামরিক প্রযুক্তি উন্নয়নের পরবর্তী অধ্যায়। আকবরের সময়ের মধ্যেই রাজ অস্ত্রাগারে পলিতা দেওয়া গাদা বন্দুকের ব্যবহার ও উৎ পাদন সাধারণ ব্যপার ছিল। আকবরের অস্ত্র নির্মাণ শালার কারিগরেরা খুব সম্ভববতঃ চক্রকার ঘোড়াযুক্ত বন্দুক নির্মানে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে বন্দুকের ঘোড়ার সাহায্যে একটি স্প্রিং যুক্ত করলে, করাতের ন্যায় কিনারা যুক্ত গন্ধক যৌগ পাইরাইট খণ্ডের সাথে ঘসা লেগে ঘুরতে থাকে এবং বারুদ কক্ষে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে।

বন্দুক নির্মাণ ও মেরামতকারীদের কাছে বন্দুকের নল তৈরী একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। নলের মধ্যে বারুদের বিস্ফোরণ সহ্য করার জন্য নলটিকে খুবই দৃঢ় হতে হয়। নলের গর্ত তৈরী এবং প্রত্যেক অংশের একই সরলরেখায় বিন্যাস খুবই নিখুঁত হওয়া দরকার।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবির মধ্যে সবচেয়ে ভাবী ব্রোঞ্জের কামান নির্মানের কৃতিত্ব ভারতেই প্রাপ্য। তবে ভারী কামানগুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কেননা তাদের গতিশীলতার ও নিশানার অভাব ছিল। তাই দেখা যায় একজন লোক সহজেই টানতে পারে এমন হাল্কা কামান তৈরীতেই আকবর বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন।

বান ও রকেট নামে এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত হয়। এটি বাঁশের তৈরী। তার অগ্রভাগে লোহার রড চোঙে দাহ্য পদার্থ থাকত।

জাহাজ নির্মাণ ঃ- ইউরোপীয় কলা কৌশল অনুকরণের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে জাহাজ নির্মাণশিল্পে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তন দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারতের সমুদ্রগামী জাহাজগুলো আকারে অনেক বড় ছিল এবং এগুলির মূল পাল খুব বড় হত। অনুকরণে তৈরী জাহাজগুলো কোন কোন বিষয়ে আসলের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ছিল। জল প্রবেশ রোধের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় জাহাজ নির্মাতাদের দড়ির টুকরোদি গুঁজে দেওয়ার সহজ পদ্ধতি অপেক্ষা একটি তক্তার সাথে অপর একটি তক্তার রিবেট করার ভারতীয় পদ্ধতি জাহাজকে অনেক বেশী শক্তিশালী করেছিল, ভারতীয় জাহাজের তক্তার উপর চূণের যৌগ লেপন করায়, সামুদ্রিক আগাছার উপদ্রব থেকে এক অসাধারন দৃঢ় সুরক্ষার ব্যবস্থাও হয়।

যাইহোক, জাহাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের ক্ষেত্রে বারত ইউরোপো থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। ভারতীয়রা নৌবাহ বিজ্ঞানের আধুনিক যন্ত্রাপতি তৈরীতে ব্যর্থ হন। অ্যাস্ট্রোলের ভারতীয় জাহাজে ব্যবহৃত প্রধান যন্ত্র হিসেবে তখনও পর্যন্ত রয়ে গেল। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নাবিক ও ক্যাপ্টেনরা ভারতীয় জাহাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন স্বভাবতঃই তারা ইউরোপ থেকে আমদানি করা দূরবীন, কৌণিক উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রাদি ব্যবহার করতেন।

গ) অরণ্যনাশ কী কী কারণে ঘটে ? এরফলে কী ক্ষতি হয় ? অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কী উপায় অবলম্বন করা যায় ?

উত্তর ঃ- উপগ্রহ মারফৎ প্রাপ্ত চিত্রের সাহায্যে জানা যায় যে, ১৯৮২ সালে আমাদের দেশের সমগ্র ভূভাগের প্রায় ১৪ শতাংশ অঞ্চল অরণ্য দ্বারা আবৃত ছিল, যার মধ্যে প্রায় ১১ শতাংশ অঞ্চল ছিল ঘন অরণ্য এবং সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুনর্নবীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ারণ্যাঞ্চল দ্রুত হারে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

বৃষ্টির জল পাহাড়ের ঢালে অবাধে প্রবাহিত হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। মাটির জলধারণ ক্ষমতা কমে আসছে। মাটির স্তর সরে যাওয়ায় জমি উষর হয়ে পড়ছে, ফলে খাদ্যশস্যের উৎ পাদন কমে যাচ্ছে। অরণ্যনিধনের এই ক্ষতিকর দিকগুলির কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার অরণ্যরক্ষণ ও বনসৃজনের একটি দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেছেন।

চ) আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহ এবং কম্পিউটারের ভুমিকা আলোচনা করুন ?

উত্তরঃ- উপগ্রহের সাহায্যে সম্প্রচারকে যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক বলা যায়। দূর দূরান্তের ছভি এবং শব্দ প্রেরক ছাড়াও উপগ্রহ সম্প্রচার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। দেশের অনেক শহর থেকেই এখন আমরা সরাসরি ডায়াল করে কেবল দেশের অন্যান্য শহরের সাথেই নয়, বিদেশের অনেক শহরের সাথেও ফোনে যোগাযোগ করতে পারি। এক্ষেত্রে আগের মতো অপারেটোরের উপর নির্ভর করতেই হয় না। সত্যি কথা বলতে কি পোর্টব্লেয়ারের মতো সাগরপারের শহর বা লে, আইজলের মতো দুর্গম শহরের ক্ষেত্রে উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাই একমাত্র সম্ভবপর ও সুবিধাজনক যোগাযোগের উপায়। ১৯৭৫-১৯৭৬ এ দেশে উপগ্রহ সহায়িত শিক্ষামূলক টেলিভিশন পরীক্ষা চালানো হয়েচিলন। তার পেছনে একটি মার্কিন উপগ্রহের সহায়তা ছিল। কিন্তু ১৯৭৮-এ ভারত সরকার তার নিজস্ব বহু উদ্দেশ্যসাধক উপগ্রহ নির্মাণ ও উ ক্ষেপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ঠিক হয়, এই ধরণের উপগ্রহ সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্তার ব্যাপক প্রসারের জন্য ব্যবহৃত হবে। এই রকম উপগ্রসহ ইনস্যাট-1A ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে উৎক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এতে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এরপর ১৯৮৩-তে ইনস্যাট 1B এবং ১৯৮৮-তে ইনস্যাট-1C উৎক্ষিপ্ত। পরবর্তীকালে আরও অনেকগুলি উপগ্রহ এরকমভাবে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। এই সমস্ত উপগ্রহগুলি আবহবিদ্যা, সম্পদ সমীক্ষা ও গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা দানের সাথে সাথে বিভিন্ন মাধ্যমের সম্প্রচার ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে প্রসারিত করেছে।

কম্পিউটার ঃ- যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে কম্পিউটার। গণক যন্ত্র হিসেবে যে কম্পিউটারের যাত্রা শুরুয হয়েছিল আজ তা 'ইলেকটরনিক মস্তিষ্ক' নামে পরিচিত। এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে কম্পিউটার প্রায় যে-কোনো ধরনের এবং বিপুল পরিমাণের তথ্য নিয়ে তাকে ধরে রাখতে ও অসাধারণ দ্রুততায় বিশ্লেষণ করতে পারে। কম্পিউটারের খবরা-খবর গ্রহণের, বর্জনের, তাকে সংক্ষিপ্ত বা বর্ধিত করার, গুছিয়ে এবং সূচীবদ্ধ করার ক্ষমতা তো আছেই। তাছাড়া কম্পিউটার নিজস্ব বার্তাসহ জবাবও পাটাতে পারে। বস্তুত, যে কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহারের পুরো চিত্রটাই কম্পিউটার পাল্টে দিয়েছে। নতুন ধরণের নির্মাণ প্রযুক্তির জন্য কম্পিউটারের দাম নেমে এসেছে এবং তার ফলে এখন বিভিন্ন অফিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমন কি বাড়িতেও কম্পিউটার জায়গা করে নিয়েছে।

বস্তুত টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে কম্পিউটার এবং উপগ্রহ ব্যবস্থা একত্রিত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এই তিনটি একত্রে সম্প্রচার ও টেলিফোনের ব্যবস্থা ব্যবসায়িক লেনদেন এমন কি মানুহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকেও পাল্টে দিয়েছে।

AMBITION

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ (উত্তর ৬০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়)

ক) গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম কী ? জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট। ৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী ঘুরছে ও সূর্য এবং নক্ষত্ররা স্থির। রাহু ও কেতুর জন্য 'গ্রহণহ হয়–এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনিই গ্রহণ-এর প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকার।

ত্রিকোণমিতির সারণী তৈরী আর্যভট্টের আরেকটি অবিস্মরণীয় অবদান। জ্যামিতিক উপায়ে আর্যভট্ট ত্রিকোণমিতির সারণি তৈরী করেছিলেন এবং সেই সারণী থেকে লব্ধ 'সাইন' ও 'কোসাইন'-মান তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার ব্যবহার করতেন। এছাড়া তিনি সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণির যোগফলের সূত্র আবিস্কার করেন, এবং n^2 এবং n^3 এইরূপ প্রগতির যোগফল নির্ণয় করেন। আর্যভট্টের পরে বরাহমিহিরের (জন্ম ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে) আগমন ঘটে। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎসংহিতা'-তে আর্যভট্ট ও তার পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজ লিপিবদ্ধ করেছেন।

গ) বায়োগ্যাস উৎপন্ন করতে কী কী কাঁচামালের প্রয়োজন হয় ? এই গ্যাসের দুটি ব্যবহার উল্লেখ করুন ? শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই গ্যাস গুরুত্ব পায় কেন ?

উত্তর ঃ- গ্রামাঞ্চলে গ্রামের গৃহপালিত পশুদের মল কাজে লাগিয়ে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা হয়। বিভিন্ন ধরণের জলজ উদ্ভিদ যেমন কচুরিপানা, সালভিনিয়া, ঝাঁকি, শৈবাল প্রভৃতি গোবরের উপযোগী সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বায়োগ্যাস রান্নার কাজে (চিত্র ১৭ .১১) ও আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা যায়। এছাড়া বায়োগ্যাস ব্যবহারের সাহায্যে উৎপন্ন বাষ্পের দ্বারা এঞ্জিন বা যন্ত্র চালানো এবং টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর যে বর্জ্য পদার্থ পড়ে থাকে তা উৎকৃষ্ট জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, শক্তি উৎপাদনের জন্য এটি একটি অর্থসাশ্রয়ী পদ্ধতি। এজন্যই বারত ও চীনের মত দেশে গ্রামাঞ্চলে বায়োগ্যাস উৎপাদক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ) দূর সন্ধান পদ্ধতি কাকে বলে ? এর সাহায্যে কীভাবে খনিজ ভাণ্ডার অনুসন্ধান করা হয় ?

উত্তর ঃ- ভূ-পৃষ্ঠের উপরে এবং ভূগর্ভে বর্তমান বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের একটি আধুনিক প্রক্রিয়া হল দূরসন্ধান পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিমান বা মহকাশযানের মত দূরবর্তী স্থান থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, মাটি, গাছপালা ও নানাবিধ খনিজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দূরসন্ধান পদ্ধতি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহই চিহ্নিত করে না, অধিকন্তু এই পদ্ধযির সাহায্যে সম্পদগুলির ভূগর্ভে সঞ্চিত পরিমাণ ও গুণগত মান সম্পর্কেও আমরা তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারি।

দূর সন্ধান সরলতম উপায় উড়োজাহাজ থেকে ক্যামেরার সাহায্যে ভূপৃহঠরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দারাবাহিক আলোকচিত্র গ্রহণ করা। উপগ্রহে স্থাপিত দূরদর্শনের ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত চিত্রাদির মাধ্যমেও জল, মেঘ, বনাঞ্চল ও ভূপৃষ্ঠের উপরের ঘরবাড়ি ও ইমারত সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। উপরের দুইটি পদ্ধতিতেই ক্যামেরার দৃশ্য,াম আলোক ব্যবহৃত হওয়ার এদের দূরসন্ধানের আলোকীয় পদ্ধতি বলা হয়। অন্যদিকে, উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে এই তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে কীভাবে প্রতিফলিত ও শোষিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। সাধারণত কয়েক সেন্টিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ এই ধরণের অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের সুবিধা হল, এই যে, ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত এই বেতার তরঙ্গ সহজেই মেঘ ভেদ করে পৃথিবীতে পৌঁছায় এবং ভূপৃষ্ঠ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মেঘের ভিতর দিয়েই আবার উপগ্রহে ফিরে যায়। অনুরূপবাবে উপগ্রহ থেকে অবলোহিত তরঙ্গের সংকেত পাঠিয়েও ভুপৃষ্ঠ তার প্রতিফলন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিফলকের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

ভু পৃষ্টের নিরবচ্ছিন্ন শিলাস্তরের কোনরূপ ফাটল বা ভূপৃষ্ঠে কোনরকম অস্বাভাবিক গঠন বৈচিত্র বর্তমান তাকলে উপগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত চিত্র তা পরিস্কারভাবে প্রকাশ পায়। যে সমস্ত অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, সচরাচর সে অঞ্চলেই ভূগর্ভে নানাবিধ খনিজ বা জল সঞ্চিত থাকে সচরাচর। রেডিও-তরঙ্গ ও চুম্বকীয় পরিমাপণের সাহায্যেও ভূগর্ভে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও তেলের ভাণ্ডার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়।

ছ) সমাজ কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে প্রভাবিত করে। উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ-ভারতীয় সমাজজীবন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কেও তিনি গভীর পর্যবেক্ষন করেন। তাঁর লেখা তেকে ভারত সম্পর্কে আমরা বহু মূল্যবান তথ্য পাই। তিনি তাঁর রচনায় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পূর্বতন যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানের উন্নয়নের উল্লেখেও তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জ্যোতিবিদ্যায় ভারতের অবদান এবং আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের কাজের সম্পর্কে বহু তথ্য তিনি লিখে গেছেন–যা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি চতুর্থ অধ্যায়ে। অল্ বিরুনীর মতে, ভারথীয়রা কণোজ, তানেশ্বর ও শ্রীনগরের (কাশ্মীর) অক্ষাংশ বার করার চেষ্টা করেছিলেন। টলেমি নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন স্থানের গ্রহণের সময়ের ওপর ভিত্তি করে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা হত। উজ্জয়িনীর মধছ্য দিয়েই তাদের মূল মধ্য রেখাটি গিয়েছিল।

অল্ বিরুনী দেখিয়েছিলেন যে, পদার্থসম্পর্কে বারতীয় ধ্যান-ধারণা গ্রীকদের অনুরূপ ছিল। পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁর মতে বিজ্ঞানের জগতে ভারতের সবচেয়ে বড় অবদান দশমিক-এর ধারনার প্রবর্তন। সংখ্যার জন্য যে সব চিহ্ন বারতীয়রা ব্যবহার করতেন পরবর্থিকালে তা আরবীয় ও বর্তমানকালে তা আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবস্থার উৎস।

AMBITION

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলনপত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪ ও জুন ২০১৫

ফলিত পাঠক্রম (A[[lication Oriented Course)

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

(AOC-2 : Food Processing)

বিভাগ - ক

যে কোনও দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

১। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি) :

এল ডি-৫০, আগমার্কা, মার্মালেড, মাইকোটক্সিন, গয়ট্রোজেন।

এল ডি-৫০ ঃ-

এটা একটা বিশেষ বিষক্রিয়া নির্দ্ধারণকারী তাৎক্ষণিক (এ্যাকিউট) টেষ্ট। কত পরিমাণ বিষ গ্রহণ করলে শতকরা ৫০ ভাগ ভোক্তার মৃত্যু হবে। বলাবাহুল্য, এটা ল্যাবরেটরীর প্রাণিদের দিয়ে করা যেমন ইঁদুর, মাউস, খরগোশ, মুরগী বা মাছের বাচ্চা। এর থেকে বিষক্রিয়ার একটা ধারণা করা যেতে পারে এবং কোনটা কত বেশি বর্জ্জ্য তাও জানা যায়। আফলাটক্সিন-এর এল ডি-৫০ খুব কম, সুতরাং এটা প্রচণ্ড বিষাক্ত। নুনে খুব বেশী, সুতরাং, নুন আমরা খাই যদিও বেশী পরিমানে খেলে বিষক্রিয়াকারী।

আগমার্ক ঃ-

ভারত গভর্ণমেন্টের ডাইরেক্টরেট অব মার্কেটিং এণ্ড ইনস্পেকশন, গ্রাম বিকাশ মন্ত্রক দ্বারা সঞ্চালিত। আগমার্কের মান আছে আবার বা অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের। আগমার্ক পরিদর্শকরা যারা আগমার্ক নিতে আগ্রহী (এটা ঐচ্ছিক-নিতে পারে, নাও নিতে পারে) ওদের কাছ থেকে নমুনা নিয়ে নিজেদের আওতায় (হয়ত নিজেদের ল্যাবরেটরীতে) বিশ্লেষণ করে আগমার্কের সিল দেবে যদি মান বিধিবদ্ধ মানের মত হয়। তখন আগমার্কা নমুনা হিসেবে আগমার্ক সিলসহ বাজারে আসবে তৃতীয় পার্টি গ্যারেন্টি। এতে নমুনার কদর ও কৌলিন্য বাড়বে বলাই বাহুল্য।

মার্মালেড প্রস্তুত প্রণালী ঃ–

১। ফল নির্বাচন - সুপক্ক ফল বেছে নেওয়া হল।

২। ফল প্রস্তুতকরণ - লেবুজাতীয় ফলের খোসার বাহিরের দিকে রঞ্জক পদার্থ ও ও উদ্বায়ী তৈল থাকে এবং ভিতরে দিকের সাদা অংশে পেক্টিন থাকে। খোসার বাহিরের দিকের হলুদ অংশ পাতলা ভাবে ছাড়িয়ে নেওয়া হল এবং ছোট ছোট টুকরো করে নেওয়া হল। এই ছোট ছোট টুকরো সিদ্ধ করে জলে ফেলে দেওয়া হল (তিক্ত ভাব দূর করার জন্য)। এই সিদ্ধ টুকরোগুলি রেখে দেওয়া হল। বহিঃস্ত্বক ছাড়ানো ফলগুলি টুকরো করে কাটা হল।

মাইকোটক্সিন ঃ-

মাইকোটক্সিন খুবই বিপদজ্জনক বিষ, কয়েক ধরনের ছত্রাক থেকে সৃষ্ট হয়। মানুষ, গরু ও মুরগীর মারাত্মক লিভারের বিষ এই মাইকোটক্সিন। ছত্রাক প্রধাণতঃ দুই ধরনের হয়। ঈষ্ট এবং মোল্ড এই দুই ধরণের মোল্ডই প্রধাণতঃ বিষাক্ত পদার্থ বাই মাইকোটকসক্ষম উৎপন্ন করে। এই ধরনের টক্সিন বা জৈব বিষ খাদ্যের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা গ্রহণ করে। মাইকোটক্সিন মিউটাজেনিক বা জিনের পরিবর্তন সাধনকারী পদার্থ এবং কারসিনোজেনিক বা ক্ষতিকারক দুই রকম ধর্মের অধিকারী।

মাইকোটক্সিন প্রধাণতঃ গৌন বিপাকীয় পদার্থ হিসাবে উৎপাদিত হয়। মুখ্য বিপাকীয় পদার্থ উৎপাদক ক্ষতিকারক মোল্ডের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। নীচে বিভিন্ন রকম মাইকোটক্সিনউৎপাদক মোল্ডের উদাহরণ দেওয়া হল–

১। অ্যাসপারজিলাস নাইগার
২। পেনিসিলিয়াম সাইট্রনাম
৩। অ্যাসপারজিলাস ক্যানডিডাস
৪। অ্যাসপারজিলাস ওরাইজি

যে রাসায়নিক বস্তু এনজাইমের ক্রিয়া বিনষ্ট করে, তাকে অ্যান্টি এনজাইম বলে। যেমন ফিতাকৃমির দেহ থেকে অ্যান্টি এনজাইম ক্ষরিত হয় যা প্রোটিন ভাঙার উৎসেচকের ক্রিয়াকে ব্যহত করে। ফলে ফিতাকৃমির দেহ প্রোটিন দিয়ে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রে পাচিত হয় না।

অ্যান্টি এনজাইম জৈব অনুঘটকের কাছে বাধা দেয়, যেমন-সয়াবিন এবং অনেক ডালে অ্যান্টি-ট্রিপসিন আছে, যেগুলি সেদ্ধ করলে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং, এগুলি কাঁচা খেতে নেই। কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমের সময় নষ্ট হয় বলে অঙ্কুরিত ছোলা, মটর ইত্যাদি খাওয়া যায়।

ভিব্রিওসিস ঃ-

ভিব্রিওসিস রোগ দেখা যায় ভিব্রিও প্যারাহেমোলাইটিকাস নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রামিত খাসদ্য গ্রহণের ফলে। এটি একটি গ্যাসট্রোএনটারিটিস জাতীয় রোগ। সাধারণত সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের ৩-৭৬ ঘন্টার মধ্যে এই রোগের সংক্রমন পরিলক্ষিত হয়। অসুস্থতা সংক্রান্ত উপসর্গ সমূহ নীচে উল্লেখ করা হল।

১। ডায়ারিয়া
২। উদর ও পেশার সংকোচন
৩। বমি বমি ভাব
৪। কাঁপুনি ভাব।
৫। মাথা ধরা ইত্যাদি।

২। সন্ধান প্রক্রিয়ায় ঈস্টের ভুমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। একটি কন্টিনিউয়াস স্টার্ড ট্যাঙ্ক ফার্মেন্টরের চিত্র অঙ্কন করুন ও বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করুন ?

উত্তর ঃ- **মোলাসেস বা ঝোলাগুড় থেকে বেকারীতে ব্যবহৃত ঈষ্ট প্রস্তুত ঃ-**

শিল্পে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়ায় স্যাকারোমাইসেস সেরিভিসি (Saccharomyces Cerevisiae) নামক ঈষ্টের সহায়তায় মোলাসেস বা ঝোলাগুড় থেকে বেকারীর ঈষ্ট প্রস্তুত করা হয়। এই বেকারীর ঈষ্ট হচ্ছে অসংখ্য ঈষ্ট কোষের সমষ্টি (Cell Biomass) বা কোষের

AMBITION

জৈব ভর। এ ইপ্রক্রিয়া কার্বণ ডাইঅক্সাইড একটি উপজাত দ্রব্য হিসাবে উৎপন্ন হয়। বেকারস ঈষ্ট পাঁউরুটি শিল্পে অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ক) স্যাকারোমাইসেস সেরিভেসি → কোষসমষ্টি বা কোষের জৈব ভর বা বেকারস ঈষ্ট (Cell Biomass / Baker's Yeast)

মোলাসেস / ঝোলাগুড়

(খ) অক্সিজেনের উপস্থিতিজনিত সন্ধান প্রক্রিয়া → কার্বন ডাইঅক্সাইড + $(CO_2)\uparrow$

২) মোলাসেস বা ঝোলাগুড় থেকে ইথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুত ঃ-

শিল্পে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়ায় স্যাকারোমাইসেস সেরিভেসি (Saccharomyces cerevisiae) নামক ঈষ্টের সহায়তায় মোলাসেস বা ঝোলাগুড় থেকে ইথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস Co^2 একটি উপজাত পদার্থ হিসাবে সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রকার পাতিত অ্যালকোহলিক পানীয় প্রস্তুতিতে ইথাইল অ্যালকোহল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ।

(ক) স্যাকারোমাইসেই সেরিভেসি → ইথাইল অ্যালকোহল (C_2H_5OH)

মোলাসেস বা ঝোলাগুড়

(খ) অক্সিজেনের উপস্থিতিজনিত সন্ধান প্রক্রিয়া → কার্বন ডাইঅক্সাইড + (CO_2)

৩) ফলের রস থেকে মদ প্রস্তুত ঃ-

ফলের রস থেকে মদ প্রস্তুতিতে অন্যতম সহায়ক ঈষ্ট হচ্ছে স্যাকারোমাইসেস ইলিপসয়ডিউস। বিভিন্ন প্রকার ফলের রস যেমন, আঙুর, আপেল, চেরী, ষ্ট্রবেরী ইত্যাদির থেকে এই মদ প্রস্তুত করা যেতে পারে। এই প্রস্তুতিও সন্ধান প্রক্রিয়ায় একটি দৃষ্টান্ত। এই প্রক্রিয়াতেও ইয়াইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় এবং ঘনত্ব (১৪-১৬%)।

ফলের রস —স্যাকারোমাইসেস ইলিপসয়ডিউস→ মদ

৪) মল্ট বা বার্লির অঙ্কুরোদ্‌গম দ্বারা সৃষ্ট পদার্থের থেকে বিয়ার প্রস্তুত ঃ-

বার্লি একটি শস্যজাতীয় পদার্থ। ইহার অঙ্কুরোদ্‌গমের (Germination) ফলে মল্ট উৎপন্ন হয়। সন্ধান প্রক্রিয়ারদ্বারা মল্ট থেকে বিয়ার উৎপাদনের স্যাকারোমাইসেস কার্লসবারজেনসিস (Saccharomyces Carlsbergensis) নামক ঈষ্টের ভুমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূ। এই প্রক্রিয়াতেও ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় এবং ইহার ঘনত্বের পরিমাণ (৬-৮%)।

মল্ট → স্যাকারোমাইসেস কার্লসবারজেনসিস → বিয়ার
কার্বণ ডাইঅক্সাইড + $(CO_2)\uparrow$

৫) চিনি থেকে সাকে মদ প্রস্তুত ঃ-

সাকে মদ জাপানে বহুল ব্যবহৃত একটি মদ। এটি চিনি বা কোনও বেশী চিনিযুক্ত ফলের অবায়বীয় সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈরী করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্যাকারোমাইসেস সাকে নামক ঈষ্টের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।

চিনি —স্যাকোরামাইসেস সাকে→ সাকে

৬) কাগজ শিল্পের বর্জ পদার্থ থেকে এককোষী প্রটোন উৎপাদন ঃ-

এই এককোষী প্রোটিন একটি জীবাণুমুক্ত প্রোটিন। কাগজ শিল্পের বর্জ্য পদার্থ থেকে ক্যানডিডা ইউটিলিস বা টরুলা ইউটিলিস ঈষ্টের উপস্থিতিতে এই উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৭) ভিটামিন B_2 বা রিবোফ্ল্যাভিন উৎপাদন ঃ-

এরিমোথেসিয়াম অ্যাসবি নামক ঈষ্ট জলে দ্রবীভূত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিটামিন–ভিটামিন B_2 বা রিবোফ্ল্যাভিন উৎপাদনে সহায়তা করে।

বিভাগ -খ

৫। খাদ্যের মান বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ- খাবারের মধ্যে ধরা যাক তেলের মান ঠিক করতে গেলে প্রথমেই তেলের পরিচয় জানা দরকার। তারপর তেলটা খাঁটি এবং ভেজালবিহীন কিনা এবং নির্দিষ্ট খাটি সরষে তেল কিনা বা কোন খারাপ গন্ধ আছে কিনা এই সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে জানাবার জন্য ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা দরকার এই মান বা গুণগুলোর ঠিক করলেই এইটা হবে তেলের মানদণ্ড। গুণমান নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় কোয়ালিটি কন্ট্রোল যাতে সাধারণত ল্যাবরেটরীতে নাব ফর্দের প্রত্যেকটা বিশ্লেষণ করে খাদ্যের নমুনার সম্বন্ধে মতামত বা রিপোর্ট তৈরী করা হয়। যত রকমের বিভিন্নতা আছে এদের সবার জন্য বেশ কয়েকটা বা অনেকগুলো নমুনা দরকার। সরষের তেলের স্যাপভ্যালু ১৬৮-১৭৭ এর মধ্যে থাকবে অর্থাৎ ১৬৮-এর কম বা ১৭৭-এর বেশী হবে না। এটাই স্যাপভ্যালুর স্বীকৃত মান বা স্পেসিফিকেশন।

খ) আর.ডি.এ. কি. ?

উত্তর ঃ- পুষ্টিদ্রব্যের দৈনিক খাওয়ার পরিমাণের সুপারিশ করা হয়েছে। রিকমোণ্ডড ডেইলি এনাওরেন্স বয়স। উড়ান দৈর্ঘ্য এবং কাজে ও শরীরের অবস্থা হিসাবে বিভিন্নতা হয়। আরডিএ হিসাব করে খাবার পছন্দ করা যায়। কিছু অসুখ যেমন মেদবৃদ্ধি, ডায়াবেটিস। খারাপ কোষ্টকাঠিণ্য এবং কোন কোন বিশেষ অবস্থায় যেমন গর্ভ ও বুকের দুধের জন্য, শারীরিক পরিশ্রমে যেমন খেলাধুলায়, কম খাওয়া বাড়ায়াটেং এ খাবার হিসাব করা যেতে পারে। দৈনিক খাওয়ার কি কি হবে এবং কত পরিমানে তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা হয়েছে। মোট ক্যালোরীর ১৫ শতাংশ ক্যালোরী খাওয়া হয়েছে প্রোটিন থেকে পেলে ভাল।

গ) এ.ডি.আই. বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর ঃ- প্রাণিদের সাহায্যে বিষগুলোর কি পরিমাণ সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মানুষকে খাওয়ানো যেতে পারে তা পরীক্ষা করে পাওয়া সব বিষয়েই এ.ডি.আই. থাকার বায়ের কথা। খাবারের মধ্যে সামলানো যায় এমন বিষকারী পদার্থ থাকেল (এ.ডি.আই-এর মধ্যে) ব্যবহার করতেই হয়। তবে কোন ক্ষেত্রেই দৈনিক পুরো খাওয়ার পরিমাণ এ.ডি.আই. এর বেশী হবে না। পুষ্টিদ্রব্য নয় এমন সব রাসায়নিককেই বিষকারী বলা যায়।

ঘ) পুষ্টিতে ফাইবারের গুরুত্ব কী ?

উত্তর ঃ- ফাইবার পলিমারের মতো খুব বড়ো যৌগ। এটি শর্করা জাতীয় খাদ্যে উপস্থিত থাকে, কিন্তু জারিত হয় না। এটি একটি প্রাকৃতিক সিন্থেটিক।

AMBITION

১। ফাইবার খাদ্যনালী পরিস্কার রাখে এবং মলত্যাগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে।
২। ফাইবার সেলুলোজ জাতীয় জলে অদ্রবণীয়।
৩। ফাইবার জারিত হয় না, মলের সাথে বেরিয়ে যায়।
৪। অ্যাসিড বা ক্ষারেরও প্রভাবিত হয় না।
৫। জলে বা তরল পদার্থে খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

৭।ক) অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর ঃ- নানা রকমের জৈব রাসায়নিক যৌগ ভিটামিনের দরকার। ভিটামিনী ক্যালেরী দেয়না বটে, তবে শর্করা প্রোটিন ও চর্বি থেকে ক্যালোরী পেতে দরকার হয়। অন্যান্য জীব বিজ্ঞানের কাজ করে শরীরের ও স্বাস্থ্যের জন্য। কিছু কিছু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিনের মতো খাবার থেকে পেতে হয়। যদিও কয়েকটা ভিটামিন এবং অন্যান্য শারীরিক রসায়ন যৌঘ ও অনুঘটন অ্যান্টি অক্সিজেন্টের কাজ করে।

খ) কয়েকটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উদাহরণ দিন ?

উত্তর - ক্যারোটিন, লাইকোপিন ও কিছু লৌহ যৌগ এরাও কাজ করে থাকে।

গ) অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কিভাবে কাজ করে ?

উত্তর ঃ- খুব দরকারী বলে খাবারের মধ্যে এবং শরীরের ভবেতরে তৈরী করে নানারকমের বন্দোবস্ত করে রেখেছে প্রকৃতি। শরীরে অক্সিজেন খুব হয়, সব শক্তিপ্রদানকারী খাদ্য যেমন চর্বি, প্রোটিন ও শর্করা এনজাইম জারিত হয়ে শেষ সময়ে অক্সিজেনে ইলেকট্রন দেয় যাতে অক্সিডেশন হয় এবং ক্যালরী তৈরী হয়। প্রত্যেক অক্সিজেন মলিকুলে চারটে ইলেকট্রন লাগে। যদি আংশিক হয় তবে ফ্রি র‍্যাডিকাল তৈরী হয়, যারা ইলেকট্রনের জন্য ক্ষুধার্ত এবং বহু যৌগিকে আক্রমণ করে। এদের জন্য অনেক অনেক অসুখ যার মধ্যে অকাল বার্দ্ধক্য ও ক্যান্সারও আছে। এন্টিঅক্সিডেন্ট এদের থেকে আমাদের বাঁচায়। ভিটামিন এ.ই.ও সি, ক্যারটিন, সাইকোনিন (যা টমেটোতে খুব আছে) ও অন্যান্য প্রাকৃতিক রং ইত্যাদি এন্টিঅক্সিডেন্ট খাবারে আছে। তাছাড়া শরীর ভেতরে তৈরী করে ইউবিকুইনোন, ইউরেট ও গ্লুটাথায়োন এবং কিছু কিছু এনজাইম, যেমন - সুপারঅক্সাইড ডিসামিউটেজ, গ্লুটাথায়োন, গ্লুটাথায়োন পারঅক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, পারঅক্সিডেজ। এনজাইমগুলো এই অক্সি বা হাইড্রক্সি ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলোকে ভেঙে দেয়। আর রাসায়নিকগুলো ইলেকট্রন দিয়ে ওদেরকে রিডিউস করে সন্তুষ্ট করে এবং নিজেরা অক্সিডাইজড হয়ে যায়।

ঘ) ফাংশনাল খাদ্য বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর ঃ- খাদ্য কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য থাকতে পারে। বিশেষ করে ঔষধি বলে পরিচিত উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন টমেটোর লাইকোপিন পুষ্টি দ্রব্য নয় কিন্তু এন্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে বহু মূল্য। টমেটোতে পিত নামে রাসায়নিক আছে যা রক্তের প্লেটলেট জড়ো (যাতে থ্রম্বোসিস হয়) করার বিরুদ্ধে কাজ করে। সাধারণ ভাবে যে যে খবরে এগুলো থাকে তাদের ফাংসনাল খাদ্য বলে।

৮। ক) সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর ঃ- সব পুষ্টিদ্রব্য সুপারিশের নিম্ন সীমার মধ্যে থাকলে সেই খাবারকে সুষম খাদ্য বলা হয়। খাসৃ সুষম হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা খাবারের পরিপূর্ণ কাজ হয় না শরীরের ও স্বাস্থ্যের স্বার্থে। এ যেন টিমের কাজ একজন মেম্বারও না থাকলে বা কমজোরী থাকলে টিমের কাজ বা সাফল্য হয় না।

সারাদিনের হিসাবে বলা হলেও প্রত্যেক খাবারই নিজস্বভাবে সুষম হবে। মধ্যাহ্ন ভোজন বা নৈশভোজন প্রধান খাবার হিসাবে ত সুষম হবেই, প্রাতঃরাশ ও টিফিন এদেরও সুষম হলে ভাল। অসম খাদ্য খাওয়া যেতে পারে তবে এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে অন্য খাবার যেন অভাবটা পূরণ করে দেয় যাতে সাকুল্যে সুষম হয়।

খ) খাদ্যবিজ্ঞানে জৈব অনুঘটকের গুরুত্ব কী ?

উত্তর ঃ- জীবনবিজ্ঞানে সব প্রক্রিয়াই সাধারণভাবে এনজাইম দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, অল্প কিছু স্বঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া। এনজাইমগুলো এক-একটা প্রোটিন নিজেদের বিশেষ বিশেষ জিনদের দ্বারা তৈরী হয়। মানুষের প্রায় হাজারেরও বেশী এনজাইম নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। অনেক প্রক্রিয়া এমনিতে প্রায় হয় না, হয়ত বা পার্শ্ব প্রক্রিয়া করে বা খুব আস্তে আস্তে অথবা শরীরের অনুপযুক্ত তাপ বা ঘন দ্রবণে হয়। অনুঘটক এই প্রক্রিয়াগুলোকে বাঞ্ছনীয় দ্রুততায়, শরীরের উপযুক্ত অম্লত্ব-ক্ষারত্ব ও তাপ বা দ্রবণে এবং পার্শ্বক্রিয়া প্রায় না ঘটিয়ে করিয়ে দিতে পারে। অনুঘটকের উল্লেখ খুব স্পষ্টভাবে রসায়নশাস্ত্রে আছে, শিল্পে প্রচুর ব্যবহার হয় নানা রকমের অনুঘটক। প্রকৃতি শরীরের জন্য প্রোটিনকেই বেছে নিয়েছে অনুঘটকের কাজের জন্য–ইহা একটা বিস্ময়ও বটে শরীর বিজ্ঞানে।

গ) খাদ্যে বিষক্রিয়া কিভাবে ঘটে ?

উত্তর ঃ- প্রকৃতি তৈরী করে রেখেছে এমন জিনিষ থেকেই খাদ্য পাওয়া যায়, যেমন-উদ্ভিজ্জ প্রধাণতঃ তাছাড়া মাছ ও মাং (জন্তু ও পাখি) আছে, অন্যান্য প্রাণিও আছে। ওদেরকে কেবল মনুষ্যভক্ষ্য করেই প্রকৃতিতে সৃহট হয়েছে এমন ভাবার কারণ নাই। প্রত্যেক প্রাণিরই নিজস্ব প্রয়োজন আছে সৃষ্টিতে সন্তুলন, পরিবেশে ভারসাম্য, খাদ্য-খাদক, পরস্পর নির্ভরতা হয়ত এমন কিছু কিছু কারণ। অনেক তথাকথিত খাদ্যই খাওয়ার অনুপযুক্ত, সামান্য কয়েকটি উপযুক্ত এবং বাকীগুলো এমন যে এদের মধ্যে কিছু মন্দাকরী বা বিষক্রিয়াকারী রাসায়নিক অল্পবিস্তর থাকে। এই শেষোক্ত তৃতীয় শ্রেণি অনেক খাদ্যদ্রব্যই খাবার হিসাবে ব্যবহার করতে হয় কারণ খাদ্য সাধারণভাবে অপ্রতুল। প্রথম শ্রেণির দ্রব্য (উদ্ভিদ ও প্রাণী) খাওয়া হয় না বিষক্রিয়ার জন্যই। কোন কোন বিষকারী বা বিপজ্জনক রাসায়নিক থাকে বলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, নানারকম রোগ, এমনকি মৃত্যুও হয়। ঐ রাসায়নিকগুলোকে বিষ বা টক্সিক দ্রব্য বলা হয়। খাদ্যে তিনভাবে বিষাক্ত বা টক্সিক দ্রব্য আসতে পারে–

১। প্রকৃতিজাতভাবে
২। খাবার তৈরী করা এবং মজুত করা বা ধরে রাখার মধ্যে এগুলো তৈরী হয়
৩। একেবারে বাইরে থেকে আসা—

ক) ইচ্ছে করে প্রযুক্তির খাতিরে মেশানো হয়, যেমন- রং, এন্টিঅক্সিডেন্ট, প্রিজারভেটিভ ইত্যাদি।
খ) খাবরের জন্য নয়, অন্য দরকারে ব্যবহৃত রাসায়নিকের অযাচিত উপস্থিতি, যেমন-পেষ্টিসাইড, সার, এ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদির লেগে থাকা অংশ
গ) পরিবশ থেকে আসা দূষণ পদার্থ, বীজানু ও বীজাণুঘটিত পদার্থ।

ঘ) খাদ্যের বিষ নিষ্ক্রিয়করণ কিভাবে করা হয় ?

উত্তর ঃ- জীবন রসায়নে খাদ্যের জারণ যেমন আছে তেমনি বিষের নিষ্ক্রিয় করাও আছে, নতুবা খাদ্যের সুফল পাওয়া সম্ভব ছিল না। খাদ্যাংশ যেমন অক্সিডাইজ হয়ে ওদের উপকারী কাজ করে, বিষ বা টক্সিন পদার্থগুলোও অক্সিডাইজ হওয়ার কারণে পোলার হয়ে জলে গুলে যায় এবং কিডনী দিয়ে প্রস্রাবের সাথে বরিয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন খাদ্যাংশ বাখাদ্যাংশের জারিত অংশের সাথে রাসায়নিক মিলনের পর বিষ বা

AMBITION

অক্সিডাইজড বিষ একইভাবে প্রস্রাবের সাথে বা অন্য কোনওভাবে শরীরের বাইরে আসতে বাধ্য হয়।

বিভাগ - গ

১১।ক) মোল্ডের প্রভাবে ডিমের পচনগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করুন ?

উত্তর ঃ- ১। মোল্ডে সংক্রমণে ডিমের খোলা এবং ভিতরে দিকে ছোপ লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের ছোপকে সাধারণভাবে সূচী ছোপ (Pin spot) বলা হয়। পেনিসিলিয়াম প্রজাতির (Penicillium sp.) মোল্ড ডিমের ভিতরের অংশের হলুদ বা নীল বা কালো ছোপের জন্য দায়ী। ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম প্রজাতির মোল্ড ঘন সবুজ রঙের জন্য দায়ী। স্পোরোট্রিকাম প্রজাতির মোল্ড গোলাপী ছোপের জন্য দায়ী।

২। ডিমের বিভিন্ন প্রকার বা প্রজাতির মোল্ডের দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে মোল্ডিনেস বলে। পেনিসিলিয়াম প্রজাতি মিউকর প্রজাতি, থ্যামনিডিয়াম প্রজাতি বটরাইটিস প্রজাতি এবং অলটারনেরিয়া প্রজাতি মোল্ড এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

খ) দুধের লাল রঙ পরিবর্তনে কোন কোন ব্যাকটেরিয়া সহায়তা করে ?

উত্তর ঃ- দুধের লাল রঙ হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে সেরাসিয়া মারসিসেন্স নামক এক ধরণের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। অনেক সময় দুধের উপরি তলে লাল রঙ দেখা যায় এবং এটি হয় ব্রেভিব্যাক্টেরিয়াম এরিথ্রোজেনেস নামক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির ফলে।

১২।ক) স্কোয়াস বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর ঃ- কমলা লেবু, কাগজি লেবু, আপেল, আঙুর, জাম আনারস ইত্যাদি ফলের জলীয় দ্রবণে প্রায় ২৫% রস এবং ৪০% কঠিন পদার্থ থাকে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সমস্ত ফলের রসকে খাদ্য সংরক্ষক পদার্থ দিয়ে সংরক্ষক করা হয়। তাকে স্কোয়াস বলা হয়। যেমন - অরেঞ্জ বা কমলালেবু স্কোয়াস।

খ)স্কোয়াস প্রস্তুতিতে কি কি খাদ্য সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়।

উত্তর ঃ-খাদ্য সংরক্ষক রাসায়নিক পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালাফাইট মেশানো হল (সর্বাধিক ৩৫০ পিপিএম) বা সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট (সর্বাধিক ১০০০ পিপিএম) মেশানো হল।

১৩।ক) খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজিং বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর ঃ- সাধারণতঃ যে পদ্ধতির সাহায্যে সকল প্রকার খাদ্যসামগ্রী ও খাদ্যবস্তু পযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা যায় এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সুরক্ষিত এবং অবিকৃতভাবে সহজে নিয়ে যাওয়া যায়, তাকে প্যাকেজিং বলে।

খ)এডিব্‌ল্ ফিল্ম প্যাকেজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- এই প্যাকেজিং একমাত্র যাকে খাদ্যদ্রব্যের সাথে সরাসরি খওওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আইসক্রীমের প্যাকেজ করতে ভুট্টার প্রোটিন বা জিন ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন স্ন্যাক ফুট এক্সিমিস্ যাতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের শোষণ করতে না পরে এরজন্য কিসমিসের ওপর স্ট্যার্চের আবরণ লাগানো থাকে। তাছাড়া বাদামের উপর মনোগ্লিসারাইডের আবরণও একটি এডিব্‌ল্ ফিল্মের উদাহরণ। মনো গ্লিসারাইডের প্রলেপ বাদাম জাতীয় খাদ্যসামগ্রী থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ফ্র্যাঙ্ক ফুট এবং মাংসের সাগসেস জাতীয় খাদ্য সামগ্রীতেও এইজাতীয় প্রোটিন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দিনে এডিব্‌ল্ ফিল্ম প্যাকেজিং-এর ব্যাপক ব্যবহার নানারকম মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্য ও পানের মশলায় ব্যবহৃতহয়।

১৪। নিম্নলিখিত ভেজালগুলি কিভাবে শনাক্ত করা যায় ? (যেকোন তিনটি)

ক) সরষেতে শেয়ালকাঁটার বীজ ঃ-

ক) দুটোর আকৃতিগত পার্থক্য খালি চোখে বা আতস কাঁচে ধরা যায়

খ) ফিল্টার পেপার ২/৩টা বীজ ক্রাস করে এক ফেংটা পেট্রোলিয়াম ইথার দেওয়ার পর ওখানে ফ্লুরোসেন্স দেখা যাবে।

স্যাংগুইনারিন ও ডাইহাইড্রোস্যাগুই নারিনের জন্য।

খ) মিষ্টান্নতে মেটানিল ইয়েলো।

উত্তর ঃ-জলের দ্রবণে ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে লাল রং হবে। মেটানিল ইয়েলো খাবারের একটি নিষিদ্ধ রং।

ঘ) কফিতে চিকোরী ঃ-

জলের উপরে ছাড়লে চিকোরী শীঘ্রই ডুবতে থাকে এবং ক্যারামেলের জন্য রং-এর স্ট্রীক দেখা যাবে।

AMBITION